— দ্বিতীয় অধ্যায় —

: পথের সন্ধানে , — আদর্শের ধ্যান :

(প্রথম পরিচ্ছেদ)

(ক) বাংলা উপন্যাসের সূচনাপর্বে , বঙ্কিম পূর্ববর্তী সময়ের প্রধান পুরুষ চরিত্র :—

" আধুনিক বাংলার কথা সাহিত্যের প্রথম নায়কই একটি বাবু চরিত্র , ১৮২১ সনে সমাচার দর্পণ পত্রিকায় যাহার প্রথম আবির্ভাব হইয়াছিল , তিনিই যেন ' নববাবু বিলাসের' মধ্যদিয়া আলালের ঘরের দুলালে উত্তীর্ণ হইয়াছেন ।" [১] আশুতোষ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের এই উক্তিকে আরও একটু সম্প্রসারিত করে বলা যায় বঙ্কিম যুগে এবং তার পরবর্তী অধ্যায়ে আমরা এই ' বাবু' সমাজের সঙ্গে পরিচিত না হলেও তাদের বিবর্তিত যুগোপযোগী চেহারার সাক্ষাৎ পাই ।

বাংলা উপন্যাসের প্রথম সার্থক স্রষ্টা বঙ্কিমচন্দ্র । কিন্তু তাঁর আগে উপন্যাসের বীজ , অংকুর ও প্রাথমিক সম্ভাবনা যে সমস্ত রচনায় দেখা গেছে সেখানে কি ধরণের পুরুষ চরিত্রের সাক্ষাৎ পাওয়া যাচ্ছে উপরের উক্তিটি তার পরিচায়ক ।

ঊনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ বাংলা উপন্যাসের জন্মকাল । কিন্তু এর প্রস্তুতি চলেছিল তার বেশ কিছুকাল পূর্ব্ব থেকেই । অষ্টাদশ

১। বাংলা কথাসাহিত্যের ইতিহাস (প্রথম খণ্ড) আশুতোষ ভট্টাচার্য পৃঃ ২০৫

শতকের শেষার্ধ থেকে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ এই দীর্ঘকাল বাংলার সমাজ জীবনে বিরাট পরিবর্তন ও ঘাত প্রতিঘাত চলে । ইংরেজের সংস্পর্শে এসে পাশ্চাত্য ভাবধারায় নতুন জীবনবোধের অনুপ্রেরণা দেখা যায় একদিকে , আবার অন্যদিকে দেখা যায় প্রাচীন প্রথা ও যুক্তিহীন সংস্কার সমূহকে সবলে আঁকড়ে ধরে থাকবার প্রবণতা, সংস্কারবাদী ও রক্ষণশীল উভয় দলের এই পরস্পর বিরোধী সংঘাত এই সময়ের পরিবেশকে উত্তাল তরঙ্গ সংকুল অবস্থায় উপনীত করে । সমসাময়িক পদ্যগ্রন্থ - বিচার - বিতর্কে - সাময়িক পত্রে এই সংক্ষুব্ধ অবস্থার পরিচয় পাওয়া যায় । এরই মধ্যে ১৮২১ খৃষ্টাব্দে 'সমাচার দর্পনের' পৃষ্ঠায় এক অভিনব রচনা সকলকে চমকিত ও আকৃষ্ট করে । এখানেই বাংলা উপন্যাসের অংকুর দেখা দিল বলা যায় । এই যে রচনাটি অভিনবত্বে ও সমকালীন চরিত্র চিত্রণের প্রবণতায় সকলকে আকৃষ্ট করেছিল তা ' বাবুর উপাখ্যান' — রচয়িতার নাম সঠিকভাবে জানা যায় না , তবে সম্ভবতঃ ' নববাবু বিলাস' , ' কলিকাতা কমলালয়' ইত্যাদির রচয়িতা ভবানী চরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এই উপাখ্যানের রচয়িতা । এই সমুদয় ব্যঙ্গ রচনায় ' বাবু' অভিধায় যে বিশেষ শ্রেণীর জীবে'র সাক্ষাৎ পাওয়া যায় এরাই প্রাক্ বঙ্কিমযুগের পুরুষ চরিত্রের প্রতিনিধি । উপন্যাসের পুরুষ চরিত্রের উপযোগী কোন বৈশিষ্ট্যই এদের মধ্যে পাওয়া যায় না । সেকালের রক্ষণশীল ও প্রগতিবাদী এই উভয় গোষ্ঠীর কোথাও এদের অবস্থিতি নয় । দোল দুর্গোৎসব ইত্যাদি সনাতন প্রথানুবর্তনে সাবেকী চাল বজায় রাখা , পোষাক পরিচ্ছদে বাঙালীয়ানার ঠাট প্রদর্শন ইত্যাদি ব্যাপারে তারা মধ্যযুগীয় বাঙালীর উত্তরসূরী । আবার দোল দুর্গোৎসব ইত্যাদি পারিবারিক অনুষ্ঠানে সাহেব সুবোকে আমন্ত্রণ , বিদেশী খানাপিনার প্রতি আগ্রহ ইত্যাদি ব্যাপারে তাঁরা প্রথার বিরোধিতাও করেছেন । আসলে এদের মধ্যে কোন শিক্ষা - দীক্ষা বা সামাজিক চিন্তা ভাবনার ছাপ নেই । দেশে পূর্ব্বের নবাব ও মহারাজের যুগ তখন অবসিত প্রায় । ইংরেজের সৃষ্ট ও কৃপাপুষ্ট হঠাৎ ধনী দেশীয়

জমিদার ব্যবসায়ী - দেওয়ান - বেনিয়ান - মুৎসুদ্দি প্রভৃতি ধনী মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের তখন প্রাধান্য । এদের পশ্চাতে কোন অতীত আভিজাত্য বা বংশমর্যাদা এবং পারিবারিক ঐতিহ্য ছিল না । যে সকল শেঠ , বসাক , মল্লিকেরা সে সময় কলকাতার নাগরিক সমাজে উচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত আগে তাদের কোন উল্লেখযোগ্য পারিবারিক মর্যাদার পরিচয় পাওয়া যায় না । সুতরাং হঠাৎ বহু ধন সম্পত্তির অধিকারে এরা সম্পূর্ণ কাণ্ডজ্ঞান শূন্য , অসংযত , অমিতাচারের পথে এগিয়ে চলেছিল । বাংলা উপন্যাসের প্রকৃরূপের পুরুষ চরিত্র এই পিচ্ছিল পথ ধরেই আবির্ভূত হয়েছিলেন । জীবন যাত্রার প্রকৃত পথের সন্ধান তখনও অনাবিষ্কৃত । শিবনাথ শাস্ত্রী এঁদের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছেন , —
" ওই সময়ে শহরের সম্পন্ন মধ্যবিত্ত ভদ্র গৃহস্থদিগের গৃহে ' বাবু ' নামে এক শ্রেণীর মানুষ দেখা দিয়াছিল । তাহারা পারসী ও স্বল্প ইংরাজী শিক্ষার প্রভাবে প্রাচীন ধর্মে আস্থাবিহীন হইয়া ভোগ সুখেই দিন কাটাইত ।
মুখে, ভ্রু-পার্শ্বে ও নেত্রকোণে নৈশ অত্যাচারের চিহ্ন স্বরূপ কালিমা রেখা , শিরে তরঙ্গায়িত বাউরিচুল , দাঁতে মিশি , পরিধানে ফিনফিনে কালাপেড়ে ধুতি , অঙ্গে উৎকৃষ্ট মসলিন বা কেমরিকের বেনিয়ান , গলদেশে উত্তমরূপে চুনট করা উড়ানী ও পায়ে পুরু বগ্লস সমন্বিত চিনের বাড়ীর জুতা । এই বাবুরা দিনে ঘুমাইয়া , ঘুড়ি উড়াইয়া , বুলবুলির লড়াই দেখিয়া , সেতার , এসরাজ বীণ প্রভৃতি বাজাইয়া , কবি , হাপ আকড়াই , পাঁচালি প্রভৃতি শুনিয়া , রাত্রে বারাঙ্গনাদিগের আলয়ে আলয়ে গীতবাদ্য ও আমোদ করিয়া কাল কাটাইত , এবং খড়দহের মেলা ও মাহেশের স্নানযাত্রা প্রভৃতির সময়ে কলিকাতা হইতে বারাঙ্গনাদিগকে লইয়া দলে দলে নৌকাযোগে আমোদ করিতে যাইত ।" [১] এই সুদীর্ঘ উদ্ধৃতি বাবুদের জীবনধারার পূর্ণ পরিচয় বহন

১। রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ — শিবনাথ শাস্ত্রী .. পৃঃ ৫৬
~~২। বঙ্কিম রচনাবলী (প্রথম খণ্ড) — সাহিত্য সংসদ ... পৃঃ ৫৫~~

করছে । অলস , মন্থর জীবনধারায় অভ্যস্ত এই 'বাবু' সমাজ ছিল ব্যক্তিত্ববোধহীন , নানা অনাচার লিপ্ত – মনুষ্যদেহী 'জীব' মাত্র । এদের জীবনে ছিলনা কোন উচ্চ আদর্শ বা চারিত্রিক দৃঢ়তা এবং সংযম ও আত্ম মর্যাদা বোধ । স্রোতে ভাসমান তৃণখন্ডের মতো এরা গতানুগতিক জীবন ধারায় ভেসে চলেছিল । অর্থের প্রাচুর্য এদের যাবতীয় ভোগবিলাসের যোগানে কোন সমস্যাই সৃষ্টি করেনি । জীবন সম্বন্ধে এদের কোন জিজ্ঞাসাও ছিল না , তাই কোন আদর্শের সংঘাতের সম্মুখীন এরা হয়নি । এদের জীবনে কোন সমস্যা ছিল না , বরং এরাই সমকালীন সমাজের সমস্যারূপে পরিগণিত হতে পারে । শিক্ষা দীক্ষার প্রতিও এরা আগ্রহী ছিল না , পূর্ব্ব পুরুষার্জিত ধন সম্পত্তির যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণও বৃদ্ধির জন্য যে বুদ্ধি খরচ দরকার তাও এদের ছিল না , বরং সে দিকে এরা পরমুখাপেক্ষী হয়ে সম্পত্তি বিনাশেই তৎপর হয়েছে । 'আলালের ঘরের দুলালের' নায়ক মতিলালের উক্তিতে এদের জীবনের উদ্দেশ্য প্রকাশিত " লেখাপড়া শেখা কেবল টাকার জন্য - আমার বাপের অতুল বিষয় আমার লেখাপড়ায় কাজ কি ? কেবল নাম সহি করিতে পারিলেই হইল ।" ৩ এ জাতীয় জীবনাদর্শ সম্বলিত পুরুষ চরিত্র যে জীবনযাপনে কেমনভাবে গতানুগতিক প্রবাহে ভেসে চলেছিল তা সহজেই অনুমেয় । ইংরাজের সৃষ্ট এই অসংখ্য নতুন জমিদার ব্যবসায়ী , শ্রেণীর হঠাৎ ধনীর দল ও এভাবেই বিষয়াসক্ত আদর্শ বিহীন , জীবন কাটিয়েছিলেন । দেশের শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রতি এদের তেমন কোন আগ্রহ ছিল না । এ সম্পর্কে শিবনাথ শাস্ত্রীর উল্লিখিত উক্তিই প্রমাণবাহী ।

এই অশিক্ষিত , উচ্ছৃঙ্খল - আদর্শবোধশূন্য হঠাৎ ধনী 'বাবু'র প্রথম প্রতিনিধি ' বাবু উপাখ্যানে'র তিলক চন্দ্রের জীবন কাহিনীও

৩। আলালের ঘরের দুলাল – প্যারীচাঁদ মিত্র (ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত)...পৃঃ ৩

এই পর্যায়ের। " বাবু ঘুড়ী বুলবুলি প্রভৃতি খেলাতে সদা মগ্ন থাকেন লেখাপড়ার দোহন আছে কিন্ত করেন না।" [৪] 'নববাবু বিলাস' এর দ্বিতীয় খন্ড (পল্লব অংশ) এই বাবুদের লক্ষণ সম্বন্ধে বলা হয়েছে —

' মনিয়া বুলবুল আখড়াই গান,
খোষ পোষাকী যশমী দান।
আড়ি ঘুড়ি কানন ভোজন
এই নবধা বাবুর লক্ষণ।" [৫]

উল্লেখ যোগ্য বিষয় হচ্ছে, এই যে 'বাবু' চরিত্রের উপস্থাপনা হোল বাংলা সাহিত্যে এরাই প্রথম পরিচিত পরিবেশের চরিত্র। বিদেশী প্রভুর কৃপাপুষ্ট এই যে 'বাবু সমাজ' অষ্টাদশ শতকের শেষার্ধে উচ্চ মধ্যবিত্ত ধনী বাঙালী সমাজের প্রতিনিধি হিসাবে ঊনবিংশ শতকের দ্বিতীয় দশক থেকে বাংলা সাহিত্যে ব্যঙ্গধর্মী নক্শা জাতীয় রচনায় স্থান পেয়েছিল এবং বাঙালী পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল এরা কেউই দেবানুগৃহীত বা দৈবীশক্তির অধিকারী পুরুষ নয়। এদের চরিত্র বর্ণনায় কোনও কল্পনা বা রোমান্সের অবকাশ নেই। বণিক ইংরেজের প্রয়োজনে নতুন তৈরী নগর কলকাতার নাগরিক জীবনের প্রতিনিধি বলেই এদের জীবনে গভীরতা কোন দিকেই পাওয়া যায় না। বাংলা সাহিত্যের পাঠকের কাছে এরাই জানিয়ে দিল ধনপতি, কালকেতু, লাউ সেনের যুগ শেষ হয়ে গেছে।

৪। উপন্যাসের কথা — দেবীপদ ভট্টাচার্য .... পৃঃ ১৪৮

[illegible]

[illegible]

৫। বাংলা কথা সাহিত্যের ইতিহাস (প্রথম খন্ড)-আশুতোষ ভট্টাচার্য - পৃঃ ২০৭

'কলিকাতা কমলালয়' গ্রন্থে ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ওই নব বাবুদের নকল শিক্ষানুরাগের ব্যঙ্গচিত্র তুলে ধরেছেন এই ভাবে – " বাবু সকল নানা জাতীয় ভাষার উত্তম উত্তম গ্রন্থ অর্থাৎ পার্সি, আরবি, ইংরাজী কেতাব ক্রয় করিয়া কেহ এক কেহ বা দুই গেলাস ওয়ালা আলমারীর মধ্যে সুন্দর শ্রেণী পূর্ব্বক এমত সাজাইয়া রাখেন যে দোকানদারের বাপেও এমন সোনার জল করিয়া কেতাব সাজাইয়া রাখিতে পারে না। আর তাহাতে এমন যত্ন করেন একশত বৎসরেও কেহ বোধ করিতে পারেন না যে এই কেতাবে কাহার হস্তস্পর্শ হইয়াছে অন্য পরের হস্ত দেওয়া দূরে থাকুক।" [৬]

১৮১৪ খৃষ্টাব্দে রামমোহন রায় কলকাতায় স্থিতিশীল হয়ে বিভিন্ন সামাজিক কু প্রথা ভাঙবার উদ্দেশ্যে বিদেশী শিক্ষার আলোকে বাঙালীকে নতুনজীবনের সন্ধানে তৎপর হবার জন্য আহ্বান জানালেন। দেশে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসারে গড়ে উঠল তৎকালীন ইয়ংবেঙ্গল সম্প্রদায়। এদের মধ্যেও নানারকম উচ্ছৃঙ্খলতা, মদ্যাসক্তি দেখা গিয়েছিল। এরা এদেশীয় বহু কুসংস্কারাচ্ছন্ন প্রথা ভঙ্গের জন্য আন্দোলন করেছেন। সমকালীন শিক্ষা, সাহিত্য ও সমাজ সংস্কার আন্দোলনে এঁদের সক্রিয়তা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কিন্তু এদের উচ্চাদর্শবাদিতায় যে জ্ঞানার্জনস্পৃহা, প্রখর যুক্তিবাদ, মননশীলতা, চারিত্রিক দৃঢ়তা ও বলিষ্ঠ পৌরুষের পরিচয় পাওয়া যায় তিলক চন্দ্র থেকে মতিলাল পর্যান্ত বাবু সমাজের চরিত্রে তার বিন্দুমাত্র সম্ভাবনাও নেই। দেবী পদ ভট্টাচার্য্য এদের সম্বন্ধে যথার্থই বলেছেন – 'বাবুর উপাখ্যান,' 'নববাবু বিলাস', কিংবা 'আলালের ঘরের দুলাল' এ যাদের কথা বলা হয়েছে তারা পাশ্চাত্য শিক্ষাপ্রাপ্ত ইয়ংবেঙ্গল দলের কেউ নয়, অর্ধশিক্ষিত ধনী সম্প্রদায়ের কথাই এই বইগুলিতে চিত্রিত হয়েছে।" [৭]

৬। বাংলা কথা সাহিত্যের ইতিহাস (প্রথম খণ্ড)– আশুতোষ ভট্টাচার্য...পৃ: ২০১

৭। উপন্যাসের কথা – দেবীপদ ভট্টাচার্য .... পৃ: ১৫১

ইংরেজের প্রতি আনুগত্যে ও বিশ্বাসে অটল এই বিষয়বিলাসী সম্প্রদায়ের সম্বন্ধে অচ্যুত গোস্বামী আরও স্পষ্ট করে বলেছেন - " এই নব্য বিত্তবান শ্রেণীর আদরে লালিত সন্তানরা এক ধরনের অদ্ভুত মানুষ নামধারী পশুতে পরিণত হয়েছিল। জীবনের বোধও তাদের কোনো মূল ছিল না, না ছিল তাঁদের দেশীয় সমাজ ও সংস্কৃতির সঙ্গে সংযোগ, না তারা পেয়েছিল উল্লেখযোগ্য রকমের পাশ্চাত্য শিক্ষা, ভোগ বিলাসীতার দেশীয় ও বিদেশীয় উভয়বিধ পথটিকে অনুসরণ করে তারা উৎসন্নে যাওয়ার একটা সোজা সরল রাস্তা রচনা করেছিল।" [৮]

দেওয়ান চক্রবর্তীর পুত্র টিনক চন্দ্রের দিন যাপনের যে চিত্র বর্ণিত হয়েছে তাতে পুত্রের শিক্ষা ও ভবিষ্যৎ ভাবনা সম্বন্ধে পিতার নিস্পৃহতা ও দূরদর্শিতার অভাব সুপ্রকাশিত — " টিনক চন্দ্র বাবু দিনে দিনে বাড়িয়া উঠিতে লাগিলেন, সকলকে কটুবাক্য বলেন, মারধর করেন, সর্ব্বদা মিথ্যা কথা বলেন, লেখাপড়া করাইলেন না, কারণ দেওয়ানজী বলেন, আমার এই ঐশ্বর্য্য রাখিয়া খাইতে পারিলে খাইবে, না রাখিতে পারিলে আমি আর কি করিব। বাবু ঘুড়ি - বুলবুলি খেলাতে মত্ত থাকেন, ইয়ার বন্ধু জুটাইয়া আমোদ প্রমোদ করেন।" [১]

এই জাতীয় পুরুষ চরিত্র যে উপন্যাসের উপযোগী নয় তা বলাই বাহুল্য। তবে এদের গুরুত্ব হচ্ছে এখানেই যে, এদের মাধ্যমে সাহিত্যে মধ্যযুগীয় গতানুগতিকতা শেষ হয়ে পরিচিত পরিবেশের ব্যক্তি উপস্থিত হচ্ছে, নগেন্দ্র দত্ত — গোবিন্দ লালের আবির্ভাব যে আসন্ন এই 'বাবু' চরিত্র

৮। বাংলা উপন্যাসের ধারা — অচ্যুত গোস্বামী ... পৃঃ ১৬ - ১৭

১। বাংলা কথা সাহিত্যের ইতিহাস (প্রথম খণ্ড) — আশুতোষ ভট্টাচার্য — পৃঃ ২০৫

গুলি তারই ইংগিতবাহী । সমাজস্রষ্টা ভবানীচরন সার্থক ভাবে সমাজের অধঃপতনের চিত্র তুলে ধরেছেন , চরিত্র সৃষ্টি সেখানে গৌণ হয়ে পড়েছে । পরবর্তী পর্যায়ে দেখা যাবে চরিত্রগুলি আরও সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে ।

কালীপ্রসন্ন সিংহের লেখা 'হুতোম প্যাঁচার নক্শা' শুধু নক্শাই - উপন্যাস নয় , তবে বাবুদের কীর্তিকলাপকে এখানেও তীব্রব্যঙ্গের কশাঘাতে জর্জরিত করা হয়েছে । " সহরের বাবুরা ফেটিং , সেলফ্ ড্রাইভিং বগি ও ব্রুটিহামে করে অবস্থাগত ফ্রেন্ড , ভদ্রলোক বা মোসাহেব সঙ্গে নিয়ে বেড়াতে বেরুলেন , কেউ বাগানে চললেন – দুই চারজন সহৃদয় ছাড়া অনেকেরি পিছনে মালভরা মোদাগাড়ি চল্লো , পছে লোকে জানতে পারে এই ভয়ে কেউ সে গাড়ির সহিস্ কোচম্যানকে তক্মা নিতে বারণ করে দেচেন – কেউ লোকাপবাদ তৃণজ্ঞান , বেশ্যাবাজী বাহাদুরির কাজ মনে করেন , বিবিজানের সঙ্গে একত্রে বসেই চলেচেন , খাতির নদারৎ "। [১০]

যে সময় নারীরা অন্তঃপুর বাসিনী হলেও তিলক চন্দ্র জাতীয় ব্যসনাসক্ত , চরিত্রের দুর্বলতার সুযোগে অন্তরপুরচারিণী নারীরাও যে কতটা উন্মার্গগামিনী হতেন এবং তার ফলে ঐ পুরুষেরা কিভাবে স্ত্রীগণের দ্বারা প্রবঞ্চিত হতেন তার চিত্রও 'বাবুর উপখ্যানে' পওয়া যায় ।'বাবুর উপখ্যানের' দুই বৎসর পরে 'নববাবু বিলাস' প্রথম প্রকাশিত হয় (১৮২৩) এখানেও যে অসহায় , ভাগ্যপ্রবঞ্চিত , অপদার্থ পুরুষ চরিত্রের উপস্থাপন হয়েছে তা সমকালে কলকাতার সমাজে অপ্রাপ্য ছিল না - রাজেন্দ্রলাল মিত্রের 'বিবিধার্থ সংগ্রহ' তে আমরা তার উল্লেখ পাই । তিনি উক্ত গ্রন্থে স্বীকার করেছেন যে , 'নববাবু বিলাসে' যে উচ্ছৃঙ্খল ধনাঢ্য ব্যক্তির চরিত্র চিত্রিত হয়েছে তার দৃষ্টান্ত সমকালীন কলকাতা সমাজে প্রচুর দেখা যেত ।

১০। হুতোম প্যাঁচার নক্শা – কালীপ্রসন্ন সিংহ ... পৃঃ ২

তবে একথা ঠিকই যে এ জাতীয় নববাবুদের কাল অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধতেই বেশী প্রকট ।

প্যারীচাঁদ মিত্রের ' আলালের ঘরের দুলালে' (১৮৫৮) নায়ক মতিলালের চরিত্রে এই বাবুদের ক্রিয়াকলাপের আরও বিস্তৃত পরিচয় পাওয়া যায় । মতিলালের পিতা বাবুরাম বাবু পুত্রের শিক্ষার জন্য তিলকচন্দ্রের পিতার ন্যায় নিশ্চেষ্ট ছিলেন না । কিন্তু তার চেষ্টা ফলপ্রসূ হয়নি । অত্যাদরে তিনিই ছেলের ভবিষ্যৎ অধঃপতনের পথ প্রথম প্রস্তুত করে দেন । তিনি নিজে শিক্ষা - সংস্কৃতি বোধহীন , অর্থভাবনায় সদা বিব্রত , ব্যক্তিত্ব ও পৌরুষহীন অসহায় পুরুষের নিদর্শন । ছেলেকে লেখাপড়া শেখানোর জন্য অধিক অর্থব্যয়ে আপত্তি তার বিষয় ভাবনার দুশ্চিন্তাকে যতটা প্রকাশ করে ছেলের ভবিষ্যৎ হিতচিন্তা ততটা নয় । সেকালে এই জাতীয় পিতার প্রচেষ্টাকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে ছেলেরা মায়েদের আদর ও প্রশ্রয়ে কিভাবে উচ্ছন্নে যাবার পথ বের করে নিত তার বিবরণ পাওয়া যায় মতিলাল ও তার সঙ্গীদের ক্রিয়াকলাপে — " মতিলাল ধুমধামে সর্ব্বদাই ব্যস্ত — বাটীতে তিলার্দ্ধ থাকে না , কখন বনভোজনে মত্ত - কখন যাত্রা দলে আকড়া দিতে আসক্ত কখন পাঁচালীর দল করিতেছে - কখন সকের দলের কবিওয়ালাদিগের সঙ্গে দেওয়া করিয়া চেঁচাইতেছে — কখন বারওয়ারি পূজার জন্য দৌড়াদৌড়ি করিতেছে কখন খেমটার নাচ দেখিতে বসিয়া গিয়াছে - কখন অনর্থক মারপিট , দাঙ্গা হাঙ্গামো উন্মত্ত আছে । নিকটে সিদ্ধি , চরস গাঁজা , গুলি , মদ অনবরত চলিয়াছে - গুড়ুক পালাই ২ ডাক ছাড়িতেছে ।" [১১] জীবনধারণের জন্য কোন কাজকর্ম নাই , কোন দায় - দায়িত্ব নাই । সমস্যা নাই , সংঘাত নাই , গড্ডালিকা প্রবাহে ভাসমান এই বাবুদের আচার আচরণ , ক্রিয়া -

---

১১। আলালের ঘরের দুলাল — প্যারীচাঁদ মিত্র (ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত) ... পৃঃ ৪২

কলাপের আরও বিস্তারিত বর্ণনা উধৃত করা হচ্ছে - " হলধর , গদাধর ও মতিলাল গোকুলের ষাঁড়ের ন্যায় বেড়ায় যাহা মনে হয় তাই করে কাহারো কথা শুনে না — কাহাকেও মানে না । হয় তাস - নয় পাশা - নয় ঘুড়ি নয় পায়রা - নয় বুলবুল একটা না একটা লইয়া সর্ব্বদা আমোদেই আছে - খাবার অবকাশ নাই শোবার অবকাশ নাই — বাড়ীর ভিতর যাইবার জন্য চাকর ডাকিতে আসিলে অমনি বলে — যা বেটা যা , আমরা যাব না । দাসী আসিয়া বলে ' ওগো মা ঠাকুরাণী যে শুতে পান না ' তাহাকেও বলে দূর হ হারামজাদি , দাসী মধ্যে মধ্যে বলে তা মরি , কি মিষ্ট , কথাই শিখেছ । ক্রমে ক্রমে পাড়ার যত হতভাগা লক্ষ্মীছাড়া — উন পাঁজুরে - বরাখুরে ছোঁড়ারা জুটিতে আরম্ভ হইল । দিবারাত্র হটগোল — বৈঠকখানায় কানপাতা ভার — কেবল হো ২ শব্দ - হাসির গররা ও তামাক চরস গাঁজার ছররা ধোঁয়াতে ও অন্ধকার হইতে লাগল ।" [১২] এই বাবুদের পোষাক পরিচ্ছদের যে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে তা শিবনাথ শাস্ত্রীর বর্ণনার সমর্থক - " বাবুরা সকলেই সর্ব্বদা ফিটফাট - মাথায় বাঁকড়া চুল — দাঁতে মিশি - সিপাই পেড়ে ঢাকাই ধুতি পরা - বুটোদার একলাই ও গাজের মেরজাই গায় - মাথায় জরির তাজ - হাতে আতরে ভুরভুরে রেশমের হাতরুমাল ও এক ২ ছড়ি পায়ে রুপা র বগলসওয়ালা ইংরাজী জুতা , ভাত খাইবার অবকাশ নাই কিন্ত খাস্তার কচুরি , খাসাগোল্লা , বরফি , নিখুতি , মনোহরা ও গোলাবি খিলি সঙ্গে ২ চলিয়াছে ।" [১৩] এই উৎমার্গ গামী পুরুষরা যে সমাজে কতখানি ত্রাসের কারণ ছিলেন তার পরিচয়ও পওয়া যাচ্ছে — " সন্ধ্যার পর

১২। আলালের ঘরের দুলাল — প্যারীচাঁদ মিত্র (ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত) — .... পৃঃ ১৩

১৩। আলালের ঘরের দুলাল — প্যারীচাঁদ মিত্র (ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত) — পৃঃ ৪২

বাবুরা দঙ্গল বাঁধিয়া বাহির হন – হয়তো কাহারো বাড়ীতে পড়িয়া লুঠ তরাজ করেন – নয় তো কাহারো কনাচে আগুন লাগাইয়া দেন – হয়তো কোন বেশ্যার বাড়ীতে গিয়া মোরমরাবত করিয়া তাহার কেশ ধরিয়া টানেন বা মশারি পোড়ান কিম্বা কাপড় ও গহনা চুরি করিয়া আনেন - নয় তো কোন কুল কামিনীর ধর্ম্ম নষ্ট করিতে চেষ্টা পান।" [১৪]

শ্রী লালবিহারী দে রচিত 'চন্দ্রমুখীর উপাখ্যান' (১৮৫৯) এর নায়ক হেমচন্দ্রের চরিত্রে প্রথমে আমরা যে গুণগুলি দেখতে পাই তাতে তাকে বাবু সমাজ থেকে পৃথকমনে চিহ্নিত করা যায়। হেমচন্দ্রের পিতা সপ্তগ্রামবাসী ভারতচন্দ্র কলকাতার এক সওদাগরের বাটীর মুৎসুদ্দি। বাংলা সাহিত্যে সম্ভবত: এই প্রথম চাকুরীজীবি মধ্যবিত্ত বাঙালীর সাক্ষাৎ পাওয়া গেল, যিনি চাকুরীর প্রয়োজনেই স্বগ্রাম ত্যাগ করে কলকাতায় এবং থাকেন। সেকালের কলকাতায় এজাতীয় চাকুরী জীবির সংখ্যা যথেষ্টই ছিল। পরবর্তী বাংলা উপন্যাসে আমরা তাদের চেহারা দেখতে পাই। মতিলালের পিতা বাবুরাম বাবুর মত আর্থিক প্রাচুর্য না থাকলেও ভারতচন্দ্রের সংসারে সুস্থলতা বর্তমান ছিল, এবং তিনি পুত্রের উপযুক্ত শিক্ষার জন্যও যথেষ্ট তৎপর ছিলেন। হেমচন্দ্র ও মতিলালের কালগত সীমায় পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। বাবু সম্প্রদায় ভুক্ত মতিলাল অষ্টাদশ শতকের শেষ ও ঊনবিংশ শতকের সূচনা কালের প্রতিনিধি। হেমচন্দ্রের কাল আরও পরে। তাই তার মানসিকতা কিছুটা উন্নত ধরনের। শিক্ষা দীক্ষা - আচার আচরণেও সে যথেষ্ট মার্জিত ও সংযত। এই সপ্তদশ বর্ষীয় যুবক সম্বন্ধে গ্রন্থটিতে বলা হয়েছে " অতি বুদ্ধিমান, বাঙ্গলা ও ইংরেজী ভাষাতে শিক্ষিত হইতেছেন। .... ঐ তরুণ বিদ্যোপার্জ্জন দ্বারা কিঞ্চিৎ সভ্য ও সদ্বিবেচক হইয়াছিলেন।" [১৫]

১৪। আলালের ঘরের দুলাল – প্যারীচাঁদ মিত্র (ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত) পৃ: ৪২

১৫। চন্দ্রমুখীর উপাখ্যান – লালবিহারী দে (দেবীপদ ভট্টাচার্য সম্পাদিত) – পৃ: ১১

অল্প বয়সে বিবাহে আপত্তি প্রকাশ এবং অবশেষে পিতার পুনঃ পুনঃ অনুরোধ সম্মত হওয়া , বিবাহের পূর্ব্বেই গোপনে ছদ্মবেশে চন্দ্রমুখীকে দেখে আসা – ইত্যাদি ব্যাপারে হেমচন্দ্র আধুনিক মানসিকতার পরিচয় দিয়েছে । এ ছাড়াও শিক্ষালাভ সম্বন্ধে তার আগ্রহ, খুগুরালয়ে বিভিন্ন তরুণীর সংগে আলাপ আলোচনায় ইংলণ্ডীয় মেয়েদের জীবনধারা , কলকাতায় বিধবা বিবাহ আন্দোলন , সমকালীন দেশীয় মেয়েদের দুরবস্থা ইত্যাদি বিষয়ের অবতারণা তার শিক্ষিত ও আধুনিক রুচিসম্পন্ন মনোভাবের প্রকাশবাহী ।

কিন্তু তার পঠদ্দশা উত্তীর্ণ কালীন কার্য্যকলাপগুলোকে পূর্ব্বের বাবু সমাজের অন্তর্ভুক্ত করেছে বলেই মনে হয় । প্রথম দিকে সে যে গুণাবলীর পরিচয় দিয়েছে তাতে তাকে সেকালের ইয়ংবেঙ্গল দলের শিক্ষার্থী মনোভাবাপন্ন হিসাবে গণ্য করা যেতে পারে কিন্তু তার পরবর্তী ক্রিয়াকলাপ পূর্ব্বের আচরণের সংগে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যহীন । হয়ত লেখক উদ্দেশ্য মূলকভাবে তার মধ্যে এই পরিবর্তন দেখিয়েছেন । সেকালের যাবতীয় নক্শাধর্মী রচনায় যে প্রচ্ছন্ন নীতিবোধ , সমাজের এই ত্রুটিগুলির সংশোধনের প্রয়াস ছিল , সম্ভবতঃ তারই প্রেরণায় লালবিহারী দে হেমচন্দ্রের চরিত্রে নৈতিক অবনতির চিত্র তুলে ধরেছেন । " এ উপন্যাসের নায়ক হেমচন্দ্র পাঠদশা উত্তীর্ণ হইয়া আপন গ্রামস্থলোকের প্রচুর প্রশংসায় ও পিতার অতিশয় স্নেহে সমবয়স্ক তরুণদের খোসামোদে ক্রমে ২ প্রকাণ্ড বাবু হইয়া উঠিলেন । তাহার পিতা ভরতচন্দ্র মধ্যে ২ বলিতেন পুত্র কোন বিষয় কর্ম্মের চেষ্টা করিলে হয় না , আমার তো তাদৃশ অর্থ নাই যে চিরকাল বাটীতে বসিয়া থাকিলে চলিবে , কলসীর জল গড়াতে ২ শেষ হইয়া যায় । কিন্তু হেমবাবু তাহাতে মনোযোগ করিতেন না, তিনি কেবল আপন ইন্দ্রিয় সুখেই মত্ত থাকিতেন "। ১৬

১৬। চন্দ্রমুখীর উপাখ্যান – লালবিহারী দে (দেবীপদ ভট্টাচার্য সম্পাদিত) পৃঃ ... ৭৪

এখানেই হেমচন্দ্র মতিলালের গোষ্ঠীর সমপর্য্যায় ভুক্ত হয়েছেন । বন্ধুদের সঙ্গে নানা বাবুগিরি করা , স্ত্রী চন্দ্রমুখীর সৎ পরামর্শ অগ্রাহ্য করে তাকে নানা কটুক্তি করা ও বলপূর্ব্বক তার কাছ থেকে অর্থ নিয়ে পারিষদবর্গের সঙ্গে বিদেশ ভ্রমনে প্রচুর অর্থব্যয় করা , নব্যবাবুদের সঙ্গে বিলাসিতায় সময় অতিবাহিত করা ও নানা দুষ্কর্মে লিপ্ত হওয়া ইত্যাদি ব্যাপারে হেমচন্দ্র তার আগের সেই সভ্য , সদ্বিবেচক বিশেষণের সম্পূর্ণ বিপরীত আচরণ সুরু করে নিজেকে মতিলালের উত্তরসূরী রূপে পরিচিত করিয়েছেন । পিতার মৃত্যুর পরে তার অবস্থা – " এখন হেমবাবু – সর্ব্ব-সর্ব্বা কর্ত্তা হইয়া গদীতে বসিলেন ও নির্বিঘ্নে ইয়ারকি করিতে লাগিলেন ও মাতার অনুরোধ বা স্ত্রীর সৎ পরামর্শ কোন প্রকারেই গ্রাহ্য করিলেন না । এই রূপে প্রচুর ধন অপব্যয় করিয়া নব্য বাবুদের মন্ত্রণায় দেশ ভ্রমণে যাত্রা করিলেন । যখন চন্দ্রমুখী শুনিলেন ভ্রষ্ট যুবাদের সঙ্গে স্বামী বিদেশে গিয়াছেন তিনি দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া মনের দুঃখ মনেই রাখিলেন । হেমচন্দ্রের মাতা কএক মাসের পর বিবেচনা করিলেন যে পুত্র আর দেশে আসিবেনা এবং সংসার ধর্ম্মও করিবেনা , সুতরাং তিনি চন্দ্রমুখীকে পিত্রালয়ে পাঠাইয়া দিয়া আপনি কাশীতে গিয়া বাস করিলেন ।" [১৭]

সেকালে নব্য শিক্ষিত যুবকদের মধ্যে খৃষ্ট ধর্ম্ম ও ব্রাহ্মধর্ম্মা - ন্দোলনের জন্য যে নাস্তিকতা ও পাশ্চাত্য শিক্ষার কুফলে যে ব্যসনাসক্তি দেখা দিয়েছিল হেমচন্দ্রের মধ্যে লেখক তারই প্রকাশ ঘটিয়েছেন - " হেম সরকারি বিদ্যালয়ে ইংরাজী ভাষা শিক্ষা করিয়া যে ২ পুস্তকাদি পাঠ করিলেন , তাহাতে তাহার হিন্দুধর্ম্মের প্রতি ভক্তির লোপ হইল ও তিনি তাহা মিথ্যা জ্ঞান

১৭। চন্দ্রমুখীর উপাখ্যান – লালবিহারী দে (দেবীপদ ভট্টাচার্য সম্পাদিত) – পৃঃ ৭৬

করিলেন । কিন্তু তাহার অন্তঃকরণে ঐশ্বরিক জ্ঞানরোপিত হইল না, কতকক্ষণ ব্রাহ্মধর্মের আলোচনা করিলেন, ফলতঃ অধার্মিক হইয়া উঠিলেন ও ক্রমে ২ রিপু সকল প্রবল হওয়াতে ইন্দ্রিয় সুখের অত্যন্ত বশীভূত হইলেন।"[১৮]

হেমচন্দ্রের জীবনের পরিণতি মতিলালের অনুরূপই দেখানো হয়েছে। তার নিদারুণ আর্থিক দুর্গতি ও বিদেশের সুজন বিহীন অবস্থায় ভিক্ষা দ্বারা জীবন যাপন, হৃত সর্ব্বস্ব মতিলালের কথাই মনে করিয়ে দেয়। " এখানে হেমবাবু বহু দেশ ভ্রমণ করিলেন, নানা প্রকার মনুষ্য দেখিলেন, অশেষ প্রকার পাপ করিলেন, এবং সমস্ত অর্থব্যয় করিলেন। নব্য বাবুরা বড়বাবুর টাকার খাক্তি হইলেই ক্রমে ক্রমে অন্তর্ধান হইতে লাগিলেন। পরে হেমবাবু জগন্নাথে একলা রহিলেন, কেননা সেই দেশেই তাহার লক্ষ্মী ছাড়ে ও নব্য বাবুরাও তাঁহাকে পরিত্যাগ করেন। এখন তিনি যৎপরোনাস্তি ক্লেশে পড়িলেন ও ভিক্ষা দ্বারা উদর পুরাইতে লাগিলেন।" [১৯]

সেকালের লেখকরা যে আদর্শবাদিতা ও নীতিবোধ দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে গ্রন্থরচনায় উদ্যোগী হয়েছিলেন তার পরিচয় 'আলালের ঘরের দুলাল' এ বরদাবাবু, বেণীবাবু এবং মতিলালের ভাই রামলাল ও চন্দ্রমুখীর উপাখ্যান - এর হেমচন্দ্রের ভাই নবকুমারের আদর্শ গুণযুক্ত চরিত্র চিত্রণের মধ্যেই প্রকাশিত। এই ধরণের আদর্শ লোকবাদী, বাস্তবে বিরল দৃষ্ট সুধী পুরুষের চেহারা বঙ্কিমের যুগেও তার পরেও বাংলা উপন্যাসে দেখা যায়।

১৮। চন্দ্রমুখীর উপাখ্যান — লালবিহারী দে (দেবীপদ ভট্টাচার্য সম্পাদিত) পৃ: — ৭৬

১৯। চন্দ্রমুখীর উপাখ্যান — লালবিহারী দে (দেবীপদ ভট্টাচার্য সম্পাদিত) পৃ: — ৭৬

এরই পাশাপাশি যে চরিত্রগুলি বাস্তবোচিত বৈশিষ্ট্যের অধিকারী তাদের মধ্যে ' আলালের ঘরের দুলাল' এর বাঞ্ছারাম , বক্রেশ্বর এবং বিশেষভাবে ঠক চাচা উল্লেখ যোগ্য । 'নববাবু বিলাসের' নববাবুর সব বিষয়ের পরামর্শদাতা খলিপা চরিত্রটি যেন আরও পরিস্ফুট হয়ে 'আলালের ঘরের দুলালে' ঠক চাচায় রূপান্তরিত হয়েছে । [redacted] শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিমত " খলিপা ঠক চাচার অগ্রদূত ।" [২০] ঠক চাচার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য লেখক দিয়েছেন " মোকাজান মিঞা আদালতের কর্ম্মে বড় পটু । অনেক জমিদার , নীলকর প্রভৃতি সর্ব্বদা তাহার সহিত পরামর্শ করিত । জাল করিতে , সাক্ষী সাজাইয়া দিতে দারোগা ও আমলাদিগকে বশ করিতে - পাতের মাল লইয়া হজম করিতে , দাঙ্গা হাঙ্গামার জোট পাট ও হয়কে নয় করিতে নয়কে হয় করিতে তাহার তুল্য আর একজন পাওয়া ভার ।" [২১] উপন্যাসের ঘটনাবলী নিয়ন্ত্রণে এ জাতীয় পুরুষ চরিত্রের ভূমিকা যথেষ্ট । তাই অদ্যাবধি বাংলা উপন্যাসে ঠক চাচার উত্তর পুরুষ সগৌরবে বিরাজ করছে - বিভিন্ন ক্ষেত্রে , বিচিত্র ভূমিকায় । " দুনিয়াদারি করতে গেলে ভাল বুরা দুই চাই - দুনিয়া সাচ্চা নয় মুই একা সাচ্চা হয়ে কি করবো ?" [২২] এ জাতীয় বাস্তব বুদ্ধিবিশিষ্ট চতুর পুরুষ চিরকালের সমাজেই দেখা যায় । বঙ্কিমের যুগেও এরা বাস্তবতার পরিচয় নিয়ে উপস্থিত হয়েছিল ।

২০। বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা — শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় — পৃঃ ২৩

২১। আলালের ঘরের দুলাল — প্যারীচাঁদ মিত্র (ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত) ... পৃঃ ১৮

২২। আলালের ঘরের দুলাল - টেকচাঁদ ঠাকুর বিরচিত (নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ভূমিকা সম্বলিত) ... পৃঃ ৮৪

বহু বিবাহের বিষময় ফলে বৃদ্ধ পুরুষের বালিকা বিবাহের প্রবণতা যে সেদিন সমাজকে কতটা অবনমিত করেছিল তা বাবুরাম বাবুর দ্বিতীয় বিবাহের ব্যাপারে সুপ্রকাশিত। পরবর্তীকালের উপন্যাসেও এ জাতীয় পুরুষের সন্ধান পাওয়া যায়।

চন্দ্রমুখীর পিতা মুনুকচাঁদ পরিবারের সকলের বিরোধিতা অগ্রাহ্য করেও যে কন্যার শিক্ষার জন্য উদ্যোগী হয়েছিলেন এখানে তাঁর চরিত্রে আধুনিকতার ইংগিত পাওয়া যায়।

দেবীপদ ভট্টাচার্য্য সম্পাদিত লালবিহারী দে'র 'চন্দ্রমুখীর উপাখ্যান' গ্রন্থের অধিবাচনে সুকুমার সেন বলেছেন — "চন্দ্রমুখী উপন্যাস নয়, বড় গল্পও নয়। চন্দ্রমুখী বিগত শতাব্দীর বাংলাদেশের এক অঞ্চলের ক্ষণ দীপ্ত চিত্রমালিকা।" [২৩] বইটিকে লেখক বিভিন্নস্থানে উপন্যাস হিসাবেই উল্লেখ করেছেন। তবে বইটি উপন্যাস কিনা সে সম্বন্ধে বিতর্কের এখানে কোন আবশ্যকতা নেই, শুধু এটুকু অবশ্য স্বীকার্য যে প্রাক্ বঙ্কিম যুগের যে সব রচনায় বাস্তব ব্যক্তি চরিত্র অংকনের প্রয়াস দেখা যায় 'চন্দ্রমুখীর উপাখ্যান' তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য।

প্রাক্ বঙ্কিম যুগের অন্যতম রচনা হানা ক্যাথারিন মলেন্সের 'ফুলমনি ও করুণার বিবরণ'। বিদেশিনী লেখিকা বইটিতে যে পুরুষ চরিত্রগুলি অংকিত করেছেন তারা গ্রামবাংলার নিম্নবর্ণের শ্রমজীবী সম্প্রদায় (শহরের ভোগ বিলাসিতায় জীবন যাপনকারী 'বাবু' সম্প্রদায়ের পাশে এই পল্লীবাসীদের দারিদ্র্য পীড়িত, সহজ সরল অনাড়ম্বর জীবন

২৩। চন্দ্রমুখীর উপাখ্যান — লালবিহারী দে (দেবীপদ ভট্টাচার্য সম্পাদিত) অধিবাচন

ধারার চিত্র বাংলা সাহিত্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা । খানসামা , ডাক হরকরা , ছুতার মিস্ত্রী ইত্যাদি বিভিন্ন পেশার শ্রমজীবী পুরুষের চিত্র এখানেই প্রথম পাওয়া গেল বলা যায় । অবশ্য লেখিকা খৃস্টধর্মের মাহাত্ম্য প্রচার উদ্দেশ্যে চরিত্রগুলিকে নিস্প্রভ করে রেখেছেন । উপন্যাসোচিত বৈশিষ্ট্য, জীবনের সমস্যা - সংঘাত বা জটিলতা এই চরিত্রগুলির মধ্যে পাওয়া যায় না । তবুও বলা যায় বাংলা উপন্যাসের আদিপর্বে এই ধর্মান্তরিত গ্রাম্য পুরুষ সম্প্রদায় বৈচিত্র্যের সন্ধান দেয় বইকি । পাদরী সাহেবের অধীনে ডাক হরকরার কর্মে নিযুক্ত প্রেমচাঁদ আদর্শ খৃস্টান পুরুষ হিসাবেই চিত্রিত । তারই পাশে ধর্মনিষ্ঠাহীন করুণার স্বামীর মদ্যপ জুয়ারী চরিত্র , মাতাল ও দুষ্ট প্রকৃতির যুবা মধু ইত্যাদি পুরুষের চরিত্র লেখিকা সহানুভূতির সঙ্গে চিত্রিত করেছেন । তাই নানাপ্রকার দুষ্কর্মে লিপ্ত হয়েও এই পুরুষ চরিত্রগুলি পাঠকের করুণামিশ্রিত সহানুভূতি লাভ করে । পরবর্তী যুগের উপন্যাস তারকনাথের 'স্বর্ণলতা' এবং আরও অনেক রচনায় পল্লীজীবনের দরিদ্র পুরুষ চরিত্রের যে উপস্থাপনা হয়েছে 'ফুলমনি ও করুণার বিবরণে' তার সূচনা একথা বলা হয়ত খুব অসঙ্গত হবেনা ।

এই পরিচিত গার্হস্থ্য জীবন চিত্রণের পাশে ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের 'অঙ্গুরীয় বিনিময়' (১৮৫৭) আমাদের আর এক নতুন জগতের সন্ধান দেয় । এখানে আমরা যে পুরুষ চরিত্রের সাক্ষাৎ পাই তারা আমাদের পরিচিত পরিবেশের অধিবাসী কেউ নয় , বহুদূরের রাজপরিবারের প্রতিনিধি । আমরা রূপকথায় যে রাজপুত্রের গল্প শুনেছি , তারা পক্ষীরাজের পিঠে চড়ে , সাতসমুদ্র তের নদীর পারে , তেপান্তরের মাঠ পেরিয়ে নিঝুমপুরের রাজকন্যার সন্ধানে ব্রতী - আমাদের বিস্ময় - কৌতূহল কল্পলোকে তাদের অস্তিত্বের সন্ধান করে । কিন্তু এখানে উপন্যাসের পাতায় যে রাজপুত্রদের পাওয়া গেল তারা কেউ রূপকথার কল্পলোকের অধিবাসী নয় ,

ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে তাদের বাস্তব অস্তিত্বের সাক্ষ্য দান করে। এদের কার্য্যকলাপও বাস্তবানুগ। 'অঙ্গুরীয় বিনিময়' গ্রন্থে লেখক এভাবে শিবাজীকে প্রথম উপস্থিত করেছেন " এমত সময়ে হঠাৎ সেই গৃহদ্বার উন্মুক্ত করিয়া অদৃষ্ট পূর্ব্ব ব্যক্তি বিশেষ তাঁহার সম্মুখীন হইলেন। তাঁহার অনতিদীর্ঘচ্ছন্দ, প্রশস্ত ললাট এবং বক্ষঃ, স্থূল গ্রীবা এবং আজানুলম্বিত ভুজ প্রভৃতি সমুদায় বীর লক্ষণাক্রান্ত শরীর এবং সুন্দর ও সহাস্য মুখ মণ্ডল, একাধারেই বীরত্ব এবং কমনীয়ত্ব গুণের প্রকাশ করিতেছিল। তাঁহার চক্ষুর্দ্বয়ের জ্যোতিঃ অতি তীব্র, বোধ হয় যেন তদ্দৃষ্টি সমুদায় প্রতিবন্ধক ভেদ করিয়া সকল বস্তুরই অভ্যন্তরে প্রবেশ করণে সক্ষম।...... ঐ আগন্তুক ব্যক্তির অক্ষিদ্বয় দেখিলেই অতি প্রখর বুদ্ধি এবং তেজস্বী স্বভাব অনুমান হইত।... তাদৃশ ব্যক্তি বাদশাহ পুত্রীর সম্মুখীন হইয়া ঈষদবনত মস্তকে অভিবাদন করত নিজ বক্ষে বাহু বিন্যাস পূর্ব্বক দণ্ডায়মান হইলেন।" [২৪]

আওরঙ্গজেব দুহিতা শত্রুকন্যা রোশিনারার সম্মুখে মারাঠাবীর শিবাজীর এই উপস্থিতি তাঁর পৌরুষ, বীরত্ব ও নারীর প্রতি শ্রদ্ধাশীলতার পরিচয় দান করে। 'বাবু' সমাজের পুরুষদের ক্ষেত্রে দেখেছি তাদের উচ্ছৃঙ্খলতা, কুলকামিনীর ধর্ম্ম নষ্ট করতেও তারা ইতস্ততঃ করেনা। কিন্তু ইতিহাস থেকে এমন পুরুষের সন্ধানও পাওয়া গেল যে শত্রুকন্যাকে বন্দিনী করে, স্বীয় অধিকারে পেয়ে সত্ত্বেও তার যথোচিত সম্মান ও মর্যাদা রক্ষায় প্রয়াসী। সুতরাং একদিকে সমাজের পরিচিত পরিবেশ থেকে পুরুষ চরিত্রের উপস্থাপনা, অপরদিকে অতীত ইতিহাসের গৌরবময় অধ্যায় থেকে আদর্শগুণযুক্ত পুরুষের সন্ধান -- প্রাক্ বঙ্কিমযুগে এই উভয়বিধ প্রচেষ্টাই পরিলক্ষিত হয়।

২৪। ভূদেব রচনাসম্ভার -- প্রমথনাথ বিশী সম্পাদিত ... পৃঃ ২৮১

পাশ্চাত্য শিক্ষা সংস্কৃতির সংগে পরিচয় হওয়ায় যে নতুন স্বদেশ প্রেমের ধারণা সেদিন দেখা দিয়েছিল হয়ত তারই প্রেরণায় ইতিহাস থেকে এমন বীরত্ব মন্ডিত আদর্শ গুণযুক্ত পুরুষ চরিত্র অংকনে সেদিনের লেখকরা উদ্যোগী হয়েছিলেন। তাই রঙ্গলালের 'পদ্মিনী' উপন্যাসে ও সেকালের বিভিন্ন নাটক ও কাব্যগ্রন্থে আমরা ঐতিহাসিক বীরপুরুষদের সংগে পরিচিত হয়েছি। বঙ্কিমচন্দ্র ও বঙ্কিম যুগের ঔপন্যাসিকেরা এ ধারাকে আরও পুষ্ট করেছেন।

'অঙ্গুরীয় বিনিময়' এর নায়ক শিবাজী তাঁর অসামান্য পৌরুষ, অপরিসীম বীরত্ব, আদর্শ, উচ্চাকাঙ্ক্ষা, আত্মমর্যাদাবোধ, মুক্তি প্রিয়তা, স্বাধীনতা স্পৃহা নিয়ে যেন উনিশ শতকের নতুন দেশভাবনায় আকাঙ্ক্ষিত পুরুষ চরিত্রের প্রতিভূ হিসাবে উপস্থাপিত হয়েছে। শিবাজীর স্বাধীনতাকামী, বীর্য দৃপ্ত চেহারার আরও পরিপূর্ণ প্রকাশ আমরা দেখতে পাব বঙ্কিমযুগের ঔপন্যাসিক রমেশচন্দ্র দত্তের 'মহারাষ্ট্র জীবন প্রভাত' উপন্যাসে। বঙ্কিমচন্দ্রের জগৎসিংহ থেকে সীতারাম পর্যন্ত ঐতিহাসিক চরিত্রগুলি এই আকাঙ্ক্ষারই আরও পূর্ণতর রূপায়ন। বঙ্কিমযুগের ঐতিহাসিক উপন্যাসের ভীড়েও আমরা এ জাতীয় চরিত্রের আরও সন্ধান পাই। সমকালীন সমাজের গতানুগতিক স্রোতপ্রবাহে যে কয়েকজন অসামান্য পুরুষ তাদের ব্যক্তিত্ব ও পৌরুষ নিয়ে স্রোতের বিরুদ্ধতা করেছিলেন তাঁরা ব্যতীত এ জাতীয় চরিত্র সেকালের সমাজে বিরলদৃষ্ট ছিল। তাই পাঠকের মুখ আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তির জন্যই যেন লেখকেরা এ জাতীয় চরিত্র সৃষ্টির জন্য সমকালীন সমাজ ছেড়ে ঐতিহাসিক দূরত্বের আশ্রয় নিয়েছিলেন। তাছাড়া রয়েছে লেখক ও পাঠকের রোমান্টিক বাসনার পূর্তি প্রচেষ্টা, সেটা ঐতিহাসিক দূরত্বের আশ্রয় গ্রহন ব্যতীত পূরণ হওয়া সম্ভব ছিল না।

বাংলা উপন্যাসে রোমান্টিকতার আবির্ভাব প্রসঙ্গে ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের অবদান সম্পর্কে অশ্রুতোষ ভট্টাচার্য্য বলেছেন —

"প্যারীচাঁদ মিত্র যেভাবে সে যুগের বাঙালীর নিতান্ত পরিচিত গার্হস্থ্য জীবন অবলম্বন করিয়া কথা সাহিত্য রচনা করিবার পথ নির্দেশ করিয়াছেন, তাহার ধারা অধিকদূর পর্যন্ত অগ্রসর হইতে পারিল না, অল্পদিনের মধ্যে আধুনিক বাংলা কথা সাহিত্যের রচনার ক্ষেত্রে রোমান্টিকতার উদ্ভব দেখা দিল এবং দুই একটি দুর্লভ ব্যতিক্রম ব্যতীত এই পথ ধরিয়াই দীর্ঘকাল যাবৎ বাংলা উপন্যাস রচিত হইয়া চলিল। এই যুগের যিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কথা সাহিত্যিক সেই বঙ্কিমচন্দ্রও এই পথেই তাঁহার সিদ্ধি লাভ করিলেন। যিনি এই পথের সর্ব্বপ্রথম পথিক, তিনিই ভূদেব চন্দ্র মুখোপাধ্যায়।" [১৫]

'অঙ্গুরীয় বিনিময়'এ শিবাজী রোসিনারার প্রেমের যে চিত্র অঙ্কিত হয়েছে তাতে পুরুষের জীবনে নারীপ্রেম সমস্যার যে রূপায়ণ তা বাংলা উপন্যাসে এখানেই প্রথম দেখা গেল। বিধর্মী শত্রুকন্যার প্রতি আকৃষ্ট হয়েও শিবাজী তাঁকে লাভ করবার জন্য আত্মমর্যাদাবোধ ও স্বধর্ম বিসর্জন দিতে প্রস্তুত নন। এখানেই এসেছে তার জীবনে সংঘাত। রোসিনারাও স্বীয় প্রেমাস্পদের ভবিষ্যত কল্যান কামনায় ও মর্যাদা রক্ষার্থে নিজেকে চরম বেদনায় সমাহিত করেছেন। বঙ্কিমের উপন্যাসে ও তার যুগের বিভিন্ন রচনায় আমরা পুরুষের জীবনে এই নারী প্রেম সমস্যারই বিভিন্নতার প্রকাশ দেখতে পাব। কোথাও তা বিচ্ছেদের বেদনায় ভারাক্রান্ত, কখনও বা মিলনের আনন্দে সার্থক। রোসিনারার প্রতি শিবাজীর প্রেম একদিকে নারীর প্রতি পুরুষের চিরন্তন আকর্ষন, অপরদিকে মারাঠা বীরের দুরন্ত স্বাধীনতা স্পৃহা, আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রয়াস এই উভয় ভাবনায় সংকট ও জটিলতা সৃষ্টি করেছে। পরবর্তী কালের উপন্যাসে এই নারী পুরুষের প্রেমের বিচিত্র রূপের সঙ্গে

১৫। বাংলা কথা সাহিত্যের ইতিহাস (প্রথম খণ্ড) — আশুতোষ ভট্টাচার্য - পৃঃ ২৩১

আমরা পরিচিত হই । ঐতিহাসিক বা সামাজিক পরিবেশ — যেখান থেকেই পুরুষ চরিত্র উপস্থাপিত হয়েছে কারও ক্ষেত্রেই এই সমস্যার জটিলতা কম নয় , এমন কি সন্ন্যাসীর জীবনেও এই নারীপ্রেম মুখ্যতা বিপর্যয়ের সৃষ্টি করেছে তা দেখা যাবে বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ' দামোদর মুখোপাধ্যায়ের ' যোগেশ্বরী' ইত্যাদি উপন্যাসে । কালীকৃষ্ণ লাহিড়ীর 'রশিনারা ' উপন্যাসেও শিবাজী রোসিনারার প্রেম সমস্যার চিত্র দেখানো হয়েছে । সুতরাং বাংলা উপন্যাসে পুরুষের জীবনে নারীপ্রেম মুখ্যতার সমস্যা প্রদর্শনের ক্ষেত্রে ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের 'অঙ্গুরীয় বিনিময়' এর নায়ক শিবাজী এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছেন ।

সিপাহী বিদ্রোহে (১৮৫৭) হয়ত বুদ্ধিজীবি বাঙালীর স্পষ্ট সমর্থন ছিলনা , কিন্তু সে যুগের হাওয়ায় যে স্বাজাত্যবোধের প্রবণতা দেখা গিয়েছিল এবং বঙ্কিম ও তার পরবর্তী রবীন্দ্র শরৎ যুগের মধ্য দিয়ে স্বাধীনতা আন্দোলনে যার পরিপূর্ণ প্রকাশ ঘটেছিল সেই স্বাজাত্য বোধের পরিচয় প্রকাশেও শিবাজী বাংলা উপন্যাসে পুরুষ চরিত্রের বিবর্তনে বিশেষ স্মরণীয় চরিত্র । ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের 'অঙ্গুরীয় বিনিময়' গ্রন্থে আওরঙ্গজেবের সেনাপতি জয় সিংহের মধ্যে আলোচনা কালে শিবাজীর চরিত্রে জাতীয় ধর্ম রক্ষার আগ্রহ , হিন্দু জয়সিংহকে হিন্দু ধর্ম ও জাতীয়তার গৌরব বৃদ্ধির জন্য উদ্বুদ্ধ করার উপযোগী বক্তব্য প্রকাশের মধ্যে যেন ঊনবিংশ শতাব্দীর জাতীয়ভাবে অনুপ্রাণিত বাঙালী পুরুষের মানসচিন্তা অতীতের এক সুধর্মনিষ্ঠ দেশপ্রেমী পুরুষের কণ্ঠে প্রচারিত হয়েছে । বাংলা উপন্যাসে জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ , সুধর্মনিষ্ঠ পুরুষ হিসাবে শিবাজী চরিত্রের এই উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রয়েছে বলা যায় ।

' অঙ্গুরীয় বিনিময়' গ্রন্থের অপর উল্লেখযোগ্য চরিত্র ঘোগল সম্রাট আওরঙ্গজেব । এই সন্দিগ্ধমনা , কূটকৌশলী ও হীন ষড়যন্ত্র পরায়ণ পুরুষ চরিত্র তার সমস্ত বিশিষ্টতা নিয়েই এখানে উপস্থিত হয়েছে ।

শিবাজী - রশিনারার প্রেম ও তার পরিণতি সম্পর্কে অনেক ক্ষেত্রেই হয়ত রোমান্টিকতার প্রভাবে ঐতিহাসিক সত্যের অনুসরণ করা সম্ভব হয়নি । কিন্তু আওরঙ্গজেব চরিত্রের সমস্ত বৈশিষ্ট্য ইতিহাস থেকেই নেওয়া হয়েছে , ইতিহাস অনুগ চরিত্র সৃষ্টির প্রয়াস এখানেই প্রথম দেখা গেল বলা যায় ।

সুতরাং , একদিকে অলস , অকর্মণ্য , শিক্ষা - সংস্কৃতিহীন , অর্থকৌলীন্যে নানা দুর্নীতি পরায়ন নাগরিক 'বাবু' সমাজ , অপরদিকে ইতিহাসের প্রেক্ষাপট থেকে আহৃত আদর্শ মহানুভব চরিত্র — এই উভয় পর্যায়ের পুরুষেরা প্রধানত: প্রাক্ বঙ্কিমযুগের রচনায় পুরুষ চরিত্রের প্রতিনিধিত্ব করেছে বলা যায় । এদেরই মাঝে আবার দরিদ্র সাধারণ শ্রমজীবি গ্রামবাসীর চেহারাও পাওয়া গেছে - ' ফুলমনি ও করুণার বিবরণ' রচনায় । আবার খলিপা , ঠক চাচা , বাঞ্ছারাম , বাবুলোর দলও এখানে নিজস্ব বৈশিষ্ট্য নিয়ে উপস্থিত হয়েছে । পরবর্তীকালের উপন্যাসে এই বিভিন্ন পর্যায়ের পুরুষের চরিত্র কিভাবে বিবর্তিত হয়েছে তা বঙ্কিম যুগ ও রবীন্দ্র শরৎযুগের মধ্যদিয়ে উপন্যাসের কালানুক্রমিক আলোচনার মধ্যে সুপরিস্ফুট হয়ে উঠবে । 'বাবু' সমাজের মানসিকতা যুগোপযোগী বৈশিষ্ট্য কিভাবে বিবর্তিত হয়ে চলেছে পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে সেই বিবর্তিত পুরুষ চরিত্রের বৈশিষ্ট্য সন্ধান করা যাবে।

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে প্রধান পুরুষ চরিত্র ও তার বিবর্তন রেখা :—

ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের ' অঙ্গুরীয় বিনিময়' উপন্যাসে আমরা যে রোমান্সের জগতের সংধান পাই বঙ্কিমের উপন্যাসে তারই ব্যাপকতা লক্ষ্য করা যায় । তবে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সাহিত্যে বিশেষ অভিজ্ঞতার বলে , সমকালীন সমাজ ও জাতীয় ভাবনার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে, স্বীয় সৃজন ক্ষমতার বিশিষ্টতায় বঙ্কিমচন্দ্র পূর্বসূরীদের প্রভাব অতিক্রম করে উপন্যাস রচনায় বলিষ্ঠ স্বাতন্ত্র্য দেখিয়েছেন । বস্তুত: তাঁর পূর্বে বাংলা সাহিত্যে উপন্যাস রচনার কোন আদর্শই ছিল না । কাহিনী নির্বাচন ও চরিত্র সৃষ্টি উভয় ক্ষেত্রেই বঙ্কিম উপন্যাস জগতে অভিনবত্ব আনয়ন করেছেন । তাই তাঁকেই প্রথম সার্থক বাংলা ঔপন্যাসিকের মর্যাদা দেওয়া হয় । হরপ্রসাদ মিত্র বলেছেন – " চরিত্র , ঘটনা এবং গল্পরস - কথাসাহিত্যের এই তিন উপাদানের প্রত্যেক দিকেই তাঁর নজর ছিল ।" [১]

বঙ্কিমের উপন্যাসে যে পুরুষ চরিত্রগুলির সাক্ষাৎ পাওয়া যায় তাঁরা রোমান্স রাজ্যের অধিবাসী হলেও বাংলা সাহিত্যে বিশিষ্ট স্বাতন্ত্র্যিকতার পরিচয় নিয়ে উপস্থিত হয়েছে । " ৯৯৭ বঙ্গাব্দের নিদাঘ শেষে একদিন একজন অশ্বারোহী পুরুষ বিষ্ণুপুর হইতে মান্দারণের পথে একাকী গমন করিতেছিলেন ।" [২]

১। বঙ্কিম সাহিত্য পাঠ – হরপ্রসাদ মিত্র ... পৃ: ৫৫০

২। বঙ্কিম রচনাবলী (প্রথম খণ্ড) – সাহিত্য সংসদ ... পৃ: ৫৩

ইনিই বঙ্কিমের সমস্ত উপন্যাসের পুরুষ চরিত্রের প্রতিনিধি । এর আগে 'অঙ্গুরীয় বিনিময়' এ শিবাজী যে ঐতিহাসিক রোমান্সের পথ ধরে এসেছিলেন, এই অশ্বারোহী ব্যক্তির পরিক্রমাও সেই পথে । তবে শিবাজীর কার্য্যক্ষেত্র বাংলাদেশের বহুদূরের আর এই অশ্বারোহী ব্যক্তির কার্য্যকলাপ বাংলাদেশেরই এক অঞ্চলে নিয়ন্ত্রিত হয়েছে — ফলে অপরিচয়ের দূরত্ব এখানে অনেকটাই হ্রাস পেয়েছে । ঔপন্যাসিক যে ভাবে এই ব্যক্তির চেহারার বর্ণনা দিয়েছেন তাতে স্বভাবতঃই সে পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণে সক্ষম হয় ।"পথিকের বয়ঃক্রম পঞ্চবিংশতি বৎসরের কিঞ্চিন্মাত্র অধিক হইবে, শরীর এতাদৃশ দীর্ঘ যে অন্যের তাদৃশ দৈর্ঘ্য অসৌষ্ঠবের কারণ হইতো । কিন্তু যুবকের বক্ষো বিশালতা এবং সর্বাঙ্গের প্রচুরায়ত গঠনগুণে সে দৈর্ঘ্য অলৌকিক শ্রী সম্পাদক হইয়াছে । প্রবৃট সম্ভূত নবদূর্ব্বাদল তুল্য বর্ণোপরি কবচাদি রাজপুত জাতির পরিচ্ছদ শোভা পাইতেছিল, কটিদেশে, কটিবন্ধে কোষ সম্বন্ধ অসি, দীর্ঘ করে বর্শা ছিল, মস্তকে উষ্ণীষ, তদুপরি একখন্ড হীরক, কর্ণে মুক্তা সহিত কুন্ডল, কন্ঠে রত্নহার"।[৩] এই সৌন্দর্য্য ও আভিজাত্য প্রকাশক পুরুষ চরিত্র বঙ্কিমের সমস্ত উপন্যাসের পুরুষ চরিত্রের প্রতিভূ । বঙ্কিমের কালে দেশে যে জাতীয় ভাবনার স্ফুরণ ও বিকাশ প্রকাশ দেখা যাচ্ছিল তাতে যে ধরনের পুরুষ এদেশবাসীর আকাঙ্খিত ছিল বাস্তবে তার সীমিতি যেন ঔপন্যাসিককে অতীত ইতিহাসের পৃষ্ঠায় সন্ধানী দৃষ্টি ফেলতে উৎসাহিত করেছিল । তাই ঐ 'বাবু' সমাজের পক্ষে বাঙালী পাঠক বঙ্কিমের এই ঐতিহাসিক চরিত্রকে সাদরে ও সাগ্রহে বরন করে নিয়েছিল ।

পাশ্চাত্য রোমান্সের ভাবরসে পরিপুষ্ট বঙ্কিমের

৩। বঙ্কিম রচনাবলী (প্রথম খন্ড) সাহিত্য সংসদ ... পৃঃ ৫৪

উপন্যাসের চরিত্র সৃষ্টিতে যে রোমান্স রসের প্রাচুর্য থাকবে তা বলাই বাহুল্য। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের উক্তি স্মরণীয় – " বঙ্কিম আনলেন সাত সমুদ্র পারের রাজপুত্রকে আমাদের সাহিত্য কন্যার পালঙ্কের শিয়রে। তিনি যেমনি ঠেকালেন সোনার কাঠি, অমনি সেই বিজয় - বসন্ত লায়লা মজনুর হাতির দাঁতে বাঁধানো পালঙ্কের উপর রাজকন্যা নড়ে উঠলেন। চলতিকালের সঙ্গে তাঁর মালাবদল হয়ে গেল, তারপর থেকে তাঁকে আজ আর ঠেকিয়ে রাখে কে"? [৪]

এই রোমান্স রাজ্যের অধিবাসী বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের পুরুষ চরিত্রগুলি যে বিভিন্ন পরিবেশ থেকে এসেছে তার অনুসন্ধানে বঙ্কিমের উপন্যাসের পরিবেশ বা ঘটনার কাল অনুযায়ী শ্রেণী বিভাগ করলে মোটামুটি তিনটি ভাগ করা যায়। কোন কোন চরিত্র ঐতিহাসিক যেমন, জগৎ সিংহ, মানসিংহ (দুর্গেশ নন্দিনী), বীরেন্দ্রসিংহ (চন্দ্রশেখর), রাজসিংহ, আওরঙ্গজেব ('রাজসিংহ'), সীতারাম ('সীতারাম') ইত্যাদি। কোন কোন চরিত্র ঐতিহাসিক কালের কাল্পনিক যেমন, ওসমান, কতলু খাঁ ('দুর্গেশনন্দিনী'), নবকুমার ('কপাল কুণ্ডলা'), হেমচন্দ্র, পশুপতি ('মৃণালিনী'), চন্দ্রশেখর, প্রতাপ ('চন্দ্রশেখর') ব্রজেশ্বর('দেবী চৌধুরাণী') । বঙ্কিমের সমকালের সমাজ পরিবেশ থেকেও কেউ এসেছে যেমন, নগেন্দ্রনাথ, দেবেন্দ্র ('বিষবৃক্ষ'), জমিদার কৃষ্ণকান্ত রায়, গোবিন্দলাল ('কৃষ্ণকান্তের উইল'), অমর নাথ, শচীন্দ্রনাথ ('রজনী') ইত্যাদি।

৪। রবীন্দ্র রচনাবলী (চতুর্দশ খণ্ড) – জন্মশত বার্ষিক সংস্করণ – ... পৃঃ ৭৬৬

সন্ন্যাসী বা সন্ন্যাসী জাতীয় চরিত্র বঙ্কিমের প্রতি উপন্যাসেই ঘটনা নিয়ন্ত্রণে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছে দেখা যায়। যোগবল অপেক্ষাও এদের বুদ্ধি চাতুর্য, ভবিষ্যৎ দূরদৃষ্টি সর্বাধিক প্রকাশিত হয়েছে। 'আনন্দমঠ' উপন্যাসটি তো কেবল সন্ন্যাসীদেরই ক্রিয়াকলাপ, পদচিহ্ন গ্রামের জমিদার মহেন্দ্রকেও গার্হস্থ্য ধর্মত্যাগ করে সন্তানধর্মে দীক্ষা নিতে হয়েছিল।

তবে বঙ্কিমের উপন্যাসের চরিত্রগুলি ঐতিহাসিক বা সামাজিক — যে পরিবেশ থেকেই উপস্থাপিত হোক্ ব্যক্তিত্বের আভিজাত্যে, আদর্শবাদিতায় এদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য প্রথম উপস্থাপনাতেই পাঠকের সম্ভ্রম মিশ্রিত বিস্ময় উদ্রেক করে। এদের মধ্যে পূর্ববর্তী বাংলা সাহিত্যের প্রভাব অপেক্ষা পাশ্চাত্য সাহিত্যের নাইট্ জাতীয় চরিত্রের প্রভাবই সর্বাধিক অনুভূত হয়।

উল্লেখ যোগ্য বিষয় হচ্ছে এই যে, 'বাংলার কৃষক' প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র যে হাসিমশেখ, রামাকৈবর্ত্ত, পরাণ মণ্ডলের বঞ্চিত জীবনের দুঃখ দারিদ্র্য পীড়িত বেদনার চিত্র তুলে ধরেছেন — উপন্যাসে কিন্তু তাদের কোন স্থান মেলে না। মনে হয়, যেহেতু বঙ্কিমের উপন্যাসে রোমান্সের প্রাচুর্য, তাই রাজা বাদশাহ নবাব মহলের গল্প ও ধনী ভূস্বামীর জীবন কথাই প্রাধান্য পেয়েছে। এমনকি বঙ্কিম যুগেও তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'স্বর্ণলতা', শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের 'ফুলজানি' ইত্যাদি সামান্য কয়েকটি উপন্যাসে ছাড়া পল্লী বাংলার দরিদ্র, গৃহস্থ পুরুষের বিশেষ সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না। ঐ হাসিম শেখ, রামা কৈবর্ত্ত বা পরান মণ্ডলের জীবন কথা উপন্যাসের অন্তর্ভুক্ত হতে আরও দীর্ঘকাল অপেক্ষা করতে হয়েছে।

সাহিত্যের ক্ষেত্রে ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধকে বলা হয়েছে 'সৃষ্টি ধর্মী সাহিত্যের যুগ Romantic imagination

এর যুগ', আর সমাজভাবনার দিক থেকে আত্মসংহতি ও চিত্তমুক্তি বা আত্মানুসন্ধানের যুগ।' সিপাহী বিদ্রোহোত্তর তৎকালীন রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে দেখা যায় কোম্পানীর হাত থেকে মহারাণীর প্রত্যক্ষ শাসনাধীনে এদেশে বৃটিশ শাসন সুপ্রোথিত। পাশ্চাত্য শিক্ষালব্ধ নতুন জাতীয়তা বোধ শিক্ষিত মানসে নতুন ভাবনার জন্ম দিচ্ছে। ফলে এদেশবাসী রাজনীতি সম্বন্ধে আগ্রহী হয়ে উঠেছে। সহমরণ প্রথা নিবর্তন, নারীমুক্তি আন্দোলন, পাশ্চাত্য শিক্ষা - স্ত্রী শিক্ষা প্রবর্তন, বিধবা বিবাহ প্রবর্তন, বাল্যবিবাহ নিষেধ বহু বিবাহের বিপক্ষতা ইত্যাদি যে সব বিভিন্ন সামাজিক সংস্কার আন্দোলন ঊনবিংশ শতকের প্রথমার্ধকে তুমুল উত্তেজনামুখর করে রেখেছিল তার ঢেউ কিছুটা প্রশমিত হওয়ায় স্বদেশ ভাবনার দিকে নতুন চিন্তার পথ খুঁজে বের করা হচ্ছিল।

যে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভব সমাজে নতুন দৃষ্টিভঙ্গীর সূচনা করল, ঊনিশ শতকের বাংলা সাহিত্য তাদের মানস প্রবণতারই সমকরবাহী। বঙ্কিমচন্দ্র নিজেও এই মধ্যবিত্ত সমাজের এবং তাঁর উপন্যাসে যে সব সামাজিক ব্যক্তির সাক্ষাৎ পাওয়া গেল তারাও এই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্রতিনিধি। সরকারী শাসনকার্যে নিযুক্ত হওয়ার সুযোগ লাভ, বিভিন্ন পেশায় নিযুক্তি এবং বিদেশী বণিকের ব্যবসাকার্যে সহায়তায় প্রচুর অর্থপ্রাপ্তি এই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর একাংশকে আর্থিক ও সামাজিক প্রতিপত্তিতে বেশ দৃঢ় করে তুলেছিল।

সমসাময়িক সাহিত্য কর্মে সমকালীন সমাজ ও জাতীয় ভাবনার ও পরিবর্তিত জীবন বোধের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। বঙ্কিমের উপন্যাসও তার ব্যতিক্রম নয়।

সাহিত্য কর্মের দ্বারা দেশবাসীর সামনে নীতি ও আদর্শ বাদের প্রচার, উৎকৃষ্ট সাহিত্য রস পিপাসা জাগানো এবং স্বদেশ প্রেমে

দেশবাসীকে উদ্বুদ্ধ করা প্রধানতঃ এ জাতীয় উদ্দেশ্য সাধন কল্পেই বঙ্কিমচন্দ্র লেখনী ধারণ করেছিলেন । তাই অতীত ইতিহাসের পৃষ্ঠা থেকে আদর্শ গুণযুক্ত পুরুষ নির্বাচন করে তার চরিত্রের মাধ্যমে বীরত্ব ও দেশপ্রেমের উদাহরণ যেমন তুলে ধরেছিলেন তেমনি আবার সামাজিক ব্যক্তির জীবনের সমস্যা ও বেদনা বোধের চিত্র অঙ্কন করে ব্যক্তি জীবনের নানা ঘাত প্রতিঘাতের সঙ্গেও পাঠককে পরিচিত করাবার চেষ্টা করেছিলেন । তবে তিনি ঐতিহাসিক বা কাল্পনিক যে পর্যায়ের চরিত্রই সৃষ্টি করেছেন তাদের গুণাবলীর বিশিষ্টতায় , ব্যক্তিত্বে , মানবিকতা বোধে, জীবনের সমস্যার উদ্ভব ও তার সমাধানে , পৌরুষে এরা নবযুগের সার্থক প্রতিনিধি বলা যায় । তারই ফলে তারা সময়কালকে অতিক্রম করে শাশ্বত কালের মহিমায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে ।

চরিত্র সৃষ্টিতে বঙ্কিমচন্দ্র নতুন যুগের মানসিকতার প্রভাব দেখালেও তাদের বংশ ও অর্থকৌলীন্য ক্ষেত্রে তিনি ঐতিহ্যের অনুবর্তী — এ কথা বলা হয়ত অসংগত হবেনা । তাই দেখা যায়,সব উপন্যাসের প্রধান পুরুষ চরিত্রই সমাজের উচ্চকোটির অর্থাৎ রাজা , জমিদার , নবাব বা ধনাঢ্য ব্যক্তি । কিছুটা ব্যতিক্রম সম্ভবতঃ চন্দ্রশেখর, যিনিবংশ মর্যাদায় সমাজের সমস্যা ,— কিন্তু নবাব মীরকাসেমের গুরু হলেও তিনি প্রভূত সম্পত্তির অধিকারী ছিলেন, উপন্যাসে তেমন কোন পরিচয় পাওয়া যায় না । নিতান্ত সাধারণ গৃহস্থরূপেই তার দিনাতিপাতের পরিচয় উপন্যাসে পাওয়া যায় । লেখক তাঁর দৃঢ় ব্যক্তিত্বের পরিচয় দিয়েছেন — ' চন্দ্রশেখর ব্রাহ্মণ এবং পন্ডিত , কিন্তু ব্রাহ্মণ - পন্ডিত নহেন — ভিক্ষা গ্রহণ করেন না ।— কাহারও কাছে দান গ্রহণ করেন না ।" [৫] "কপাল কুন্ডলা" উপন্যাসের নায়ক নবকুমার পূর্বপত্নী পদ্মাবতী ওরফে লুৎফন্নিসার প্রণয় ও সম্পদের প্রলোভন প্রত্যাখ্যান কালে বলেছিলেন , " আমি দরিদ্র ব্রাহ্মণ , ইহজন্মে দরিদ্র ব্রাহ্মণই থাকিব । তোমার দত্ত ধন সম্পদ লইয়া যবনী আর হইতে

৫। বঙ্কিম রচনাবলী (প্রথম খন্ড) সাহিত্য সংসদ .... পৃঃ ৪১১

পারিব না ।" [৬] নবকুমার এখেত্রে নিজেকে দরিদ্র ব্রাহ্মণ বললেও উপন্যাসে তাঁর দারিদ্র্য পীড়িত জীবনের কোন চিত্র পাওয়া যায় না । বরং ঔপন্যাসিক উপন্যাসের প্রথমদিকে তার সম্বন্ধে বলেছেন - ' নবকুমার দরিদ্রের সন্তান ছিলেন না ।" [৭] সুতরাং নবকুমারের নিজেকে দরিদ্র ব্রাহ্মণ ঘোষণার তাৎপর্য্য বিশেষ উদ্দেশ্য প্রণোদিত মনে হয় ।

বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম উপন্যাস ' দুর্গেশ নন্দিনী'র নায়ক জগৎ সিংহ আকবর শাহের দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ মহারাজ মানসিংহের পুত্র । উপন্যাসে তার উপস্থাপনাতেই ঔপন্যাসিক তাঁর আচরণ পোষাক পরিচ্ছদের বর্ণনার মধ্য দিয়ে তাঁর অভিজাত চরিত্রের পরিচয় দিয়েছেন । এই উপন্যাসের অপর প্রধান পুরুষ চরিত্র ওসমান খাঁ নবাব কতলু খাঁর সেনাপতি । তাঁর প্রথম পরিচিতিও তার আভিজাত্য প্রকাশক— " যে ব্যক্তি অকস্মাৎ এইরূপ বিমলাকে বিহ্বল করিল , তাহার পরিচ্ছদ পাঠান জাতীয় সৈনিক পুরুষ দিগের ন্যায় । পরিচ্ছদের পারিপাট্য ও মহার্ঘ গুণ দেখিয়া অনায়াসে প্রতীতি হইতে পারিত , এ ব্যক্তি কোন মহৎ পদাভিষিক্ত । অদ্যাপি তাহার বয়সত্রিংশতের অধিক হয় নাই , কান্তি অতিশয় শ্রীমান , , তাঁহার প্রশস্ত ললাটোপরি যে উষ্ণীষ সংস্থাপিত ছিল , তাহাতে এক খন্ড মহার্ঘ হীরক শোভিত ছিল ।" [৮] 'মৃণালিনী'র নায়ক হেমচন্দ্র মগধ রাজপুত্র । পশুপতি "গৌড়দেশের ধর্ম্মাধিকার অসাধারণ ব্যক্তি , তিনি দ্বিতীয় গৌড়েশ্বর ।" [৯] 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসের

৬। বঙ্কিম রচনাবলী (প্রথম খন্ড) সাহিত্য সংসদ — ... পৃঃ ৪১১
৭। ঐ ঐ ঐ ... পৃঃ ১৩১
৮। ঐ ঐ ঐ ... পৃঃ ৮৩
৯। ঐ ঐ ঐ ... পৃঃ ২১৩

নবাব মীর কাসেম খাঁ সুবে বাংলা বিহার ও উড়িষ্যার অধিপতি। মেবারের রাণা রাজসিংহ, জগৎ প্রথিত বাদশাহ্ আলমগীর এবং নবাবের অন্যতম সেনাপতি মবারক 'রাজসিংহ' উপন্যাসের প্রধান পুরুষ চরিত্র। মবারক সম্বন্ধে উপন্যাসে বলা হয়েছে - "অশ্বারোহী যুবা পুরুষ। দেখিয়া আহেলেবিলায়ত মোগল বলিয়া বোধ হয়। তিনি অত্যন্ত সুশ্রী, মোগলের ভিতরও এরূপ সুশ্রী পুরুষ দুর্লভ। তাহার বেশভূষার অতিশয় পারিপাট্য দেখিয়া একজন বিশেষ সম্ভ্রান্ত লোক বলিয়া বোধ হয়। অপুত্ত সম্ভ্রান্ত বংশীয়।" [১০] 'দেবী চৌধুরাণী'র ব্রজেশ্বর জমিদার তনয়। 'সীতারাম' উপন্যাসের নায়ক সীতারাম ভূষণার অধিপতি, তিনি বাদশাহী সনদের বলে এবং নিজ বাহুবলে 'বাঙালার দ্বাদশ ভৌমিকের' উপর আধিপত্য স্থাপন করে মহারাজ উপাধি গ্রহণ করেছিলেন।

কোন কোন উপন্যাসে দেখা যায়, অন্যতম প্রধান পুরুষ চরিত্র দরিদ্রের সন্তান বা প্রথম জীবনে দরিদ্র হলেও ঔপন্যাসিক তাদের ধনী হবার সুযোগ দিয়েছেন। যেমন, 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসের প্রতাপ। উপক্রমনিকা অংশে লেখক তাকে দরিদ্র বলেছেন কিন্তু এই দরিদ্র প্রতাপকেই পরে জমিদারে পরিণত করেছেন -- "চন্দ্রশেখর নবাবের সরকারে প্রতাপের চাকরী করিয়া দিলেন। প্রতাপ স্বীয় গুণে দিন দিন উন্নতি লাভ করিতে লাগিলেন। এক্ষণে প্রতাপ জমিদার।" [১১] 'রাজসিংহ' উপন্যাসের মানিকলালও কতকটা এই পর্যায়ের। প্রথমে আমরা তাকে দস্যুরূপে দেখতে পাই পরে সে রাণা রাজসিংহের বিশ্বস্ত সৈনিক ও রাণার দক্ষিণহস্ত স্বরূপ মর্যাদার অধিকারী

১০। বঙ্কিম রচনাবলী (প্রথম খণ্ড) -- সাহিত্য সংসদ ... পৃঃ ৬১৪

১১। ঐ ঐ ঐ .. পৃঃ ৪১৮

হয়েছে । 'সীতারাম' উপন্যাসের গঙ্গারাম ও নিতান্ত দরিদ্র অবস্থা থেকে রাজানুগ্রহে নগর রক্ষকের পদে উন্নীত হয়েছে ।

কেবলমাত্র ঐতিহাসিক ও ঐতিহাসিক কালের উপন্যাসের পুরুষ চরিত্রই নয় , সমকালীন সমাজ পরিবেশ থেকে যে পুরুষ চরিত্রগুলি আহৃত হোল তারাও ধনাঢ্য ব্যক্তি । ' বিষবৃক্ষে'র নায়ক নগেন্দ্রনাথ গোবিন্দ পুরের জমিদার , উপন্যাসের অপর প্রধান পুরুষ চরিত্র দেবেন্দ্র দেবীপুরের জমিদার । হরিদ্রাগ্রামের জমিদার কৃষ্ণকান্ত রায়ের ভ্রাতুষ্পুত্র , জমিদারীর অর্দ্ধেক অংশের অধিকারী গোবিন্দলাল 'কৃষ্ণকান্তের উইল' উপন্যাসের নায়ক । 'রজনী' উপন্যাসের অমরনাথও ধনীর সন্তান এবং তার নিজেরও ধন সম্পদের কোন অভাব ছিল না । শচীন্দ্র এই উপন্যাসের অন্যতম প্রধান পুরুষ চরিত্র - ধনীর সন্তান ।

এই বিভিন্ন পরিবেশ থেকে গৃহীত ধনবান ব্যক্তিদের জীবনের সমস্যাই বঙ্কিম তার উপন্যাসের উপজীব্য করেছেন । এর আগে আমরা বাবু সমাজের ধনবান ব্যক্তিদের যে জীবন চিত্র দেখেছি, বঙ্কিমের উপন্যাসের ধনীগণ মানসিকতায় তাদের থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন জগতের অধিবাসী । বঙ্কিমের উপন্যাসেই আমরা প্রথম পুরুষ চরিত্রের বৈচিত্র্য প্রত্যক্ষ করলাম । ভবতোষ দত্তের মন্তব্য এ প্রসঙ্গে উদ্ধৃত করা যেতে পারে – " বঙ্কিমের উপন্যাসে গোবিন্দলাল আছে , চন্দ্রশেখর আছে , গঙ্গারাম আছে , আবার প্রতাপ আছে , সীতারাম আছে , অমরনাথও আছে । কেউ ভোগী , কেউ ত্যাগী , কেউ স্বার্থপর , কেউ অনুশোচনায় ম্রিয়মাণ ।" [১২] সৌন্দর্য্যপ্রিয় বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের প্রতিটি চরিত্রই অসাধারণ সৌন্দর্যের অধিকারী ।

১২। চিন্তানায়ক বঙ্কিমচন্দ্র – ভবতোষ দত্ত ... পৃঃ ১৪৭

প্রভৃ বঙ্কিম যুগের রচনায় 'বাবু' চরিত্রের মধ্যে এমন সৌন্দর্য্য বর্ণনা দেখা যায় না । ভূদেবের শিবাজী চরিত্রের উপস্থাপনায় এই প্রবণতা দেখা গেছে । সংস্কৃত সাহিত্যের ও মধ্যযুগীয় দেবানুগৃহীত প্রথানুবর্তী সাহিত্যের ঐতিহ্য এক্ষেত্রে কার্য্যকরী মনে হয় । বঙ্কিম এক্ষেত্রেও সেই ঐতিহ্যের অনুসরণ করেছেন বলা যায় । প্রমথনাথ বিশী বলেছেন - " বঙ্কিমের উপন্যাস জগৎ সৌন্দর্য্য ময় । উপন্যাসের পাত্রপাত্রী , মুখ্য - গৌণ সকলেই সুন্দর ।"[১৩] বঙ্কিমের সমস্ত পুরুষ চরিত্রই দৈহিক সৌন্দর্য্যে অতুলনীয় । এরই সঙ্গে ঐতিহাসিক চরিত্রগুলির মধ্যে যুক্ত হয়েছে বীরত্বের অসামান্যতা । ঔপন্যাসিকের বিরল প্রতিভা সমস্ত চরিত্র সৃষ্টিতেই অসাধারণ ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছে ।

" একজন নৌকায় রহিল , একজন তীরে নামিল । যে নামিল তাহার নবীন যৌবন , উন্নত বলিষ্ঠ দেহ , যোদ্ধৃবেশ । মস্তকে উষ্ণীষ , অঙ্গে কবচ , করে ধনুর্ব্বাণ , পৃষ্ঠে তূণীর , চরণে অনুপদীনা , এই বীরাকার পুরুষ পরম সুন্দর ।"[১৪] 'মৃণালিনী' উপন্যাসের নায়ক হেমচন্দ্রকে ঔপন্যাসিক এ ভাবেই প্রথম উপস্থাপিত করেছেন । অবশ্য ঔপন্যাসিক তাকে এভাবে বীরবেশে উপস্থিত করলেও উপন্যাসের ঘটনাবর্তে জগৎসিংহ বা ওসমান , অথবা প্রতাপ , রাজসিংহ , মবারক , মানিকলাল , সীতারাম ইত্যাদির মত যুদ্ধক্ষেত্রে বীরত্ব প্রদর্শন ও বুদ্ধি চাতুর্য্যের পরিচয় প্রদানের কোন সুযোগ দেননি ।

১৩। বঙ্কিম সরণী — প্রমথনাথ বিশী ... পৃঃ ২২

১৪। বঙ্কিম রচনাবলী (প্রথম খণ্ড) — সাহিত্য সংসদ ... পৃঃ ১৮৯

'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসের প্রতাপ কোন ঐতিহাসিক চরিত্র নয়। কিন্তু ঔপন্যাসিক তার মধ্যে বহু আদর্শ গুণের সমন্বয় ঘটিয়েছেন। নরেন্দ্র ফষ্টরের বজরা থেকে রামচরণের সহায়তায় শৈবলিনীর উদ্ধার সাধন ব্যাপারে প্রতাপ অসামান্য বীরত্ব ও প্রত্যুৎপন্ন মতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। 'আমার নাম প্রতাপ রায়, নবাবও আমাকে ভয় করেন।" [১৫] প্রতাপের এই উক্তি যে নিরর্থক আত্মম্ভরিতা নয় তিনি নিজের কার্যকলাপের মধ্য দিয়ে তার প্রমাণ দিয়েছেন। ইংরেজের নবাব মীরকাসেমের শিবির আক্রমণ করলে সেই দুর্জয় রণে সুসজ্জিত অস্ত্রধারী হিন্দু সেনা নিয়ে প্রতাপের অগ্রসর হওয়া তার বীরত্বের পরিচায়ক। "কেবল এক হিন্দু বড় যুদ্ধ করিয়াছে" [১৬] রমানন্দ স্বামীর প্রশ্নের উত্তরে জনৈক সিপাহীর এই উক্তি যুদ্ধক্ষেত্রে প্রতাপের বীরত্বের সমর্থক।

রূপনগরের রাজকন্যা চঞ্চলকুমারীকে কেন্দ্র করে রাজসিংহ ও আওরঙ্গজীবের মধ্যে যে বিরোধিতা সুরু হয় সেই ঘটনা অবলম্বনে 'রাজসিংহ' উপন্যাস রচিত। ইতিহাস মেবারের রাণা এবং ভারতের মহামান্য নবাব উজিরের বীরত্ব সম্বন্ধে যে পরিচয় দিয়েছে ঔপন্যাসিক তাঁর উপন্যাসে তা সমর্থন করেছেন। কিন্তু ঘটনা বিস্তারের জন্য যে দুটি কাল্পনিক চরিত্র সৃষ্টি করেছেন উপন্যাসে তারাই বেশী আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। বীরত্ব প্রদর্শন ও সংকটকালে বুদ্ধি চাতুর্যের পরিচয় প্রদানে এরা যথেষ্ট প্রশংসার দাবী রাখে। দস্যু মানিকলালের আকস্মিকভাবে প্রত্যুৎপন্ন বিশ্বস্ত সৈনিকে রূপান্তর

১৫। বঙ্কিম রচনাবলী (প্রথম খণ্ড) — সাহিত্য সংসদ ... পৃঃ ৪৪১
১৬। ঐ ঐ ঐ ... পৃঃ ৪৭৫

কতটা স্বাভাবিকতার পরিচায়ক সে বিতর্কে না গিয়ে বলা যায় যে , চরিত্রটি প্রখর বুদ্ধিমত্তার সাহায্যে নিজেকে আকর্ষণীয় করে তুলেছে । পার্বত্য রুদ্ধপথে চঞ্চল কুমারীকে মোগল সেনার হাত থেকে উদ্ধার কার্যে ব্যাপৃত রাজসিংহের বাহিনীকে সহায়তা করবার জন্য মোগল সৈনিকের ছদ্মবেশে সেনাবাহিনীর মধ্যে প্রবেশ করে তাদের বিপথে চালনা করা এবং ঐ ছদ্মবেশেই রূপনগরের রাজার কাছ থেকে সৈন্য সংগ্রহ করা - এর মধ্যেও তার অপূর্ব্ব প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব ও কৌশলী মস্তিষ্কের পরিচয় রয়েছে ।

প্রত্যক্ষযুদ্ধে মবারক যে বীরত্ব প্রদর্শন করেছে তাও যথেষ্ট প্রশংসার পরিচায়ক । সীতারাম চরিত্রেও লেখক বীরত্ব প্রদর্শনের যথেষ্ট সুযোগ দিয়েছেন । চরিত্রটির পরিণতি বেদনাদায়ক ।

কর্মসূত্রে বঙ্কিমচন্দ্র কলকাতার বাইরে বিভিন্ন জায়গায় ঘুরেছেন । তাই তাঁর সমকালে কলকাতায় যে নানা বিক্ষোভ ও আন্দোলন চলেছিল তার সঙ্গে তাঁর বিশেষ কোন প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ছিল না । হয়ত তাই তাঁর উপন্যাসে আমরা সমকালীন আন্দোলন বিক্ষুব্ধ পুরুষের কোন চেহারা তেমন খুঁজে পাই না । ' মনুষ্যত্ব কি' ? — প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন , '' সকল প্রকার মানসিক বৃত্তির সম্যক অনুশীলন , সম্পূর্ণ স্ফূর্ত্তি ও যথোচিত উন্নতি ও বিশুদ্ধিই মনুষ্য জীবনের উদ্দেশ্য । '' ১৭ উপন্যাসের চরিত্র সমূহের মধ্যে বঙ্কিম এই মনুষ্যত্বের আদর্শ প্রদর্শন করেছেন । তাই তাঁর উপন্যাসে আমরা 'হৃদয়বান , বিচারবুদ্ধি সম্পন্ন , বলিষ্ঠ মানুষের সন্ধান পাই । সমকালীন সমাজে যে জাতীয় চরিত্র আকাঙ্ক্ষিত কিন্তু সংখ্যায় সীমিত

১৭। বঙ্কিম রচনাবলী (দ্বিতীয় খণ্ড) সাহিত্য সংসদ ... পৃঃ ৩৭৫

ছিল, বঙ্কিম তাদেরই তাঁর রচনায় উপস্থিত করেছেন। তাঁর উপন্যাসের পুরুষ চরিত্রের মধ্যে আদর্শবাদিতা ও মহৎ গুণাবলীর সমন্বয় দেখা যায়। এরা পরোপকার বৃত্তিতে, স্বদেশ প্রেমে, নারীর প্রতি শ্রদ্ধা ও মর্যাদাবোধে, কর্তব্যনিষ্ঠায়, ক্ষমাশীলতা ও উদারতায় এবং সংস্কারমুক্ত মনোভাবে প্রত্যেকেই অসামান্য। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সাহিত্য সম্বন্ধে সুগভীর অভিজ্ঞতা নিয়ে রোমান্স রচনায় বিশেষ কৃতিত্বের অধিকারী বঙ্কিমচন্দ্র এই সব আদর্শ পুরুষ চরিত্রের মাধ্যমে তাঁর রোমান্টিক মানসিকতার তৃপ্তি সাধনে তৎপর হয়েছিলেন—এ কথা মনে হলেও তাঁর পুরুষেরা বাংলা উপন্যাসে চরিত্র চিত্রণের বিবর্তনে যে গুরুত্ব পূর্ণ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী তা অবশ্য স্বীকার্য।

বিজিত দত্ত 'দুর্গেশনন্দিনী'কে বাংলা উপন্যাসের 'মাইলস্টোন' বলেছেন। পুরুষ চরিত্রের আলোচনা প্রসঙ্গেও এই মন্তব্যের যাথার্থ অনুধাবন করা যায়। শৈলেশ্বরের মন্দিরে অসহায়, অপরিচিতা রমণীদের প্রতি জগৎ সিংহের সহৃদয় আচরণ রোশিনারার প্রতি শিবাজীর আচরণের কথা মনে করিয়ে দেয় সত্যই, তবে জগৎ সিংহ যেন শিবাজী অপেক্ষা অধিক পরিস্ফুট রূপে চিত্রিত হয়েছে।

'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসের নায়ক নবকুমার নবযুগের সার্থক প্রতিনিধি। এ উপন্যাসের ঘটনাকাল লেখকের কালের দুইশত পঞ্চাশ বৎসর পূর্ববর্তী বলে উপন্যাসে উল্লিখিত হয়েছে। জাহাঙ্গীর বাদশাহের আমলের এই বঙ্গীয় যুবক যে সংস্কার মুক্ত, উদার হৃদয়ের পরিচয় দিয়েছেন তা সেই আমলের বাংলাদেশে বিরলদৃষ্ট। সপ্তগ্রামবাসী নবকুমার গঙ্গাসাগরে গিয়েছিলেন, প্রকৃতির সৌন্দর্য্য পিপাসু হৃদয়ের তাগিদে, কোন পুণ্য সঞ্চয়ের উদ্দেশ্য বা তীর্থদর্শনের আকাঙ্খা তাকে প্রলুব্ধ করেনি। দিকভ্রান্ত নাবিকদের প্রতি তিরস্কাররত বৃদ্ধকে তিনি যখন বলেন, "মহাশয়, যাহা জগদীশ্বরের হাত, তাহা পণ্ডিতে বলিতে পারে না — ও মূর্খ কি প্রকারে বলিবে"? [১৮]

১৮। বঙ্কিম রচনাবলী (প্রথম খণ্ড) — সাহিত্য সংসদ ... পৃঃ ১০৭

অথবা বৃদ্ধের তীর্থদর্শনে পুণ্য সঞ্চয়ের অভিলাষ শুনে স্বীয় অভিমত ব্যক্ত করেন, " যদি শাস্ত্র বুঝিয়া থাকি, তবে তীর্থদর্শনে যেরূপ পরকালের কর্ম হয়, বাটী বসিয়াও সেইরূপ হইতে পারে।" [১৯] — তখন মনে হয় মধ্যযুগীয় বাংলার নানা সংস্কার সম্পন্ন পুরুষের কণ্ঠে এ উক্তি দুর্লভ। নবকুমার ঊনবিংশ শতকের সংস্কারমুক্ত, বাস্তবতাবোধ প্রসূত অবতারই যেন প্রকাশ করেছেন। বিপদে ধৈর্য্যধারণ ও স্থিরবুদ্ধির পরিচয় দান ক্ষুধার্ত নৌকারোহীদের জন্য সঙ্গী বিহীন অবস্থায় একাকীই কাষ্ঠ সংগ্রহে প্রবৃত্ত হওয়ায় তার দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধ এবং পরোপকার বৃত্তি তাকে উপন্যাসের প্রারম্ভেই পাঠকবর্গের কাছে আকর্ষণীয় করে তুলেছে। কপালকুণ্ডলার চেষ্টায় তার জীবন রক্ষা হলে, কাপালিকের রোষাগ্নি থেকে কপালকুণ্ডলাকে রক্ষা করবার জন্য অধিকারী যখন নবকুমারকে ঐ অজ্ঞাত কুলশীলা নারীকে বিবাহ করবার জন্য অনুরোধ করেন তখন নবকুমারের আচরণ ও পরিশেষে প্রত্যুত্তর তার অসামান্য পৌরুষ ও জীবনদাত্রীর প্রতি সুগভীর কর্তব্য নিষ্ঠার পরিচায়ক। বঙ্কিমের আচার নিষ্ঠ, রক্ষণশীল মন অবশ্য অসবর্ণ বিবাহের পরিপোষক ছিল না বলেই এক্ষেত্রে নবকুমারের সংগে কপালকুণ্ডলার জাতি - বর্ণে সমতা দেখানো হয়েছে। তবুও কেবলমাত্র অপরিচিত অধিকারীর কথায় বিশ্বাসস্থাপন করে অজ্ঞাত পরিচয়াকে ধর্মপত্নী হিসাবে গ্রহণ, কৌলীন্য প্রথা শাসিত সমাজের পুরুষের পক্ষে যথেষ্ট ঔদার্য্যের পরিচায়ক - " আজি হইতে কপাল কুণ্ডলা আমার ধর্মপত্নী। ইহার জন্য সংসার ত্যাগ করিতে হয়, তাহাও করিব।" [২০]

১৯। বঙ্কিম রচনাবলী (প্রথম খণ্ড) — সাহিত্য সংসদ ... পৃঃ ১৩৭

২০। ঐ ঐ ঐ ... পৃঃ ১৫১

নবকুমারের এই উক্তিও তাকে নবযুগের প্রতিনিধি হিসাবেই পরিচিত করায় ।

সপ্তগ্রামের পথে দুর্ঘটনায় পতিত মতিবিবির সঙ্গে আকস্মিক ভাবে পরিচয় , তাকে নিয়ে নিকটবর্তী চটীতে উপস্থিতি , তাঁর সঙ্গে কথাবার্তায় ও আচরণে নবকুমার মার্জিত রুচি ও মনের পরিচয় দিয়েছেন । নারীর প্রতি এই শ্রদ্ধাবোধ ও নবযুগের অন্যতম অবদান । এই মতিবিবি তার পূর্ব পরিণীতা স্ত্রী পদ্মাবতী পরিচয় নিয়ে নবকুমারকে লাভ করবার জন্য অগাধ ধনসম্পদের লোভ দেখিয়ে প্রণয় নিবেদন করলে নবকুমার যে দৃঢ়তার সঙ্গে তা প্রত্যাখ্যান করেছে তার মধ্যেও দৃপ্ত পৌরুষ ও বলিষ্ঠ চরিত্রের পরিচয় বিদ্যমান ।

'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসের প্রতাপ ও চন্দ্রশেখর চরিত্র দুটির মধ্যেও এ জাতীয় দৃঢ়ব্যক্তিত্ব ও বলিষ্ঠ পৌরুষের পরিচয় পাওয়া গেছে । উপন্যাসের ঐতিহাসিক চরিত্র মীরকাসেমের স্বাধীন চেতা মনোভাব এবং প্রজাবাৎসল্যে যেন দীর্ঘকালের পরশাসনের প্রতিক্রিয়ায় আকাঙ্ক্ষিত শাসক চরিত্র রূপে চিত্রিত হয়েছে । " আমি নিশ্চিত জানি , এ বিবাদে আমি রাজ্যভ্রষ্ট হইব , হয়ত প্রাণে নষ্ট হইব । তবে কেন যুদ্ধ করিতে চাই ? ইংরেজরা যে আচরণ করিতেছেন , তাহাতে তাঁহারাই রাজা , আমি রাজা নই । যে রাজ্যে আমি রাজা নই , সে রাজ্যে আমার প্রয়োজন ? কেবল তাহাই নহে । তাঁহারা বলেন , 'রাজা আমরা , কিন্তু প্রজা পীড়নের ভার তোমার উপর । তুমি আমাদিগের হইয়া প্রজাপীড়ন কর'। কেন আমি তাহা করিব ? যদি প্রজার হিতার্থে রাজ্য করিতে না পারিলাম , তবে সে রাজ্য ত্যাগ করিব — অনর্থক কেন পাপ ও কলঙ্কের ভাগী হইব ? আমি সেরাজউদ্দৌলা নহি — বা মীরজাফর নহি ।" [২১] এই দীর্ঘ উক্তিতে মীরকাসেম চরিত্রের যে

২১। বঙ্কিম রচনাবলী (প্রথম খণ্ড) — সাহিত্য সংসদ ... পৃঃ ৪০৩

প্রজাহিতৈষণার মনোভাব ব্যক্ত হয়েছে বঙ্কিমের নিজের যুগে শাসকের মধ্যে তার সম্পূর্ণ অভাব ছিল বলেই যেন মীরকাসেম চরিত্র আমাদের কাছে এতটা আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। ইতিহাস এই হতভাগ্য নবাবের যে রাজোচিত দায়িত্ব বোধ ও প্রজাকল্যাণকামী চরিত্রের আভাস দেয় ঔপন্যাসিক যেন সেই সদ্‌গুণাবলী দ্বারাই চরিত্রটিকে চমৎকারিত্ব দানে প্রয়াসী হয়েছেন। মনুষ্যত্বের আদর্শ সন্ধানে বঙ্কিম এভাবে ঐতিহাসিক যতগুলি চরিত্র উপস্থিত করেছেন তার প্রত্যেকেই এমন আদর্শ গুণের অধিকারী। ঐতিহাসিক চরিত্র এবং সেকালের কল্পিত চরিত্রে যেমন মহৎ গুণের সমন্বয় দেখিয়েছেন তেমনি সমকালীন সমাজ পরিবেশ থেকে যে চরিত্রগুলি গ্রহণ করেছেন তারাও রূপে ও গুণে অসামান্য।

সাহিত্য চর্চার অধিকাংশকালে বঙ্কিম মফঃস্বলে থাকায় তৎকালীন কলকাতা-কেন্দ্রিক জীবনের আন্দোলনের সঙ্গে বিশেষ যোগাযোগ না থাকলেও 'বিধবা বিবাহ' আন্দোলন নিয়ে যে তিনি কিছু চিন্তা করছিলেন এবং সেখানেও তাঁর রক্ষণশীল, নীতিনিষ্ঠ মানসিকতা কার্যকরী হয়েছিল 'বিষবৃক্ষ' ও 'কৃষ্ণকান্তের উইল' উপন্যাসে তার পরিচয় পাওয়া যায়। অবশ্য উপন্যাসের ঘটনা বিশ্লেষণে মনে হয় সমস্যাটা বিধবা বিবাহ অপেক্ষা পুরুষের নারীরূপ মুগ্ধতাও একাধিক বিবাহ সম্পর্কেই বেশী প্রযোজ্য। এখানকার পুরুষদের চরিত্রেও দেখা যায় তাঁরা রূপে গুণে অতুলনীয়। বিষবৃক্ষের নায়ক নগেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে ঔপন্যাসিক লিখেছেন - " জগদীশ্বর তাঁহাকে সকল সুখের অধিপতি করিয়া পৃথিবীতে পাঠাইয়াছিলেন। রূপ, অতুল ঐশ্বর্য্য, নীরোগ শরীর, সর্ব্ব ব্যাপিনী বিদ্যা, সুশীল চরিত্র, স্নেহময়ী সাধ্বী স্ত্রী, এ সকল একজনের ভাগ্যে প্রায় ঘটেনা। নগেন্দ্রের এ সকলই ঘটিয়াছিল। প্রধানতঃ, নগেন্দ্র নিজ চরিত্রগুণেই চিরকাল সুখী, তিনি সত্যবাদী অথচ প্রিয়ংবদ, পরোপকারী অথচ ন্যায়নিষ্ঠ, দাতা, অথচ মিতব্যয়ী,

স্নেহশীল, অথচ কর্তব্য কর্মে স্থির সংকল্প। পিতামাতা বর্তমান থাকিতে তাহাদিগের নিতান্ত ভক্ত এবং প্রিয়কারী ছিলেন, ভার্যার প্রতি নিতান্ত অনুরক্ত ছিলেন, বন্ধুর হিতকারী, ভৃত্যের প্রতি কৃপাবান, অনুগতে প্রতিপালক, শত্রুর প্রতি বিবাদশূন্য। তিনি পরামর্শে বিজ্ঞ, কার্যে সরল, আলাপে নম্র, রহস্যে বাঙময়। এরূপ চরিত্রের পুরস্কারই অবিচ্ছিন্ন সুখ, নগেন্দ্রের অশৈশব তাহাই ঘটিয়াছিল। তাঁহার দেশে সম্মান, বিদেশে যশঃ অনুগত ভৃত্য, প্রজাগণের সন্নিধানে ভক্তি, সূর্যমুখীর নিকট অবিচলিত অপরিমিত, অকলুষিত স্নেহরাশি।" [২২] এই সুদীর্ঘ উদ্ধৃতি নগেন্দ্রনাথের সর্ব্বগুণ সম্পন্ন আদর্শ, সুখী জীবনের পরিচায়ক। বাস্তবে আমরা এ জাতীয় চরিত্রের বিশেষ সাক্ষাৎ পাইনা – যার জীবনে কোনদিক দিয়েই কোন অপূর্ণতা বা এুটি নেই। নগেন্দ্রনাথ এত গুণবান ও বিবেচক হওয়া সত্ত্বেও কুসুমে কীটের মত তার চরিত্রে নারীরূপ মুগ্ধতার অবলম্বনে বিপর্যায়ের রাহু প্রবেশ করেছিল যার ফলে, তাঁকে ভাবতে হয়েছিল, তেত্রিশ বৎসর বয়সেই তার সব সুখ বিনষ্ট হয়েছে, যার ফলে তিনি মৃত্যু আকাঙ্ক্ষা করেছিলেন। মহৎ চরিত্রের এই বেদনাদায়ক বিপর্যয় চরিত্রটিকে অধিকতর আকর্ষণীয় করে তুলেছে বলা যায়।

নগেন্দ্রনাথের জ্ঞাতিভ্রাতা দেবেন্দ্রনাথ উপন্যাসের ঘটনা নিয়ন্ত্রনে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছে। গৃহে তার স্ত্রী কুরূপা, মুখরা, অপ্রিয়বাদিনী ও আত্মপরায়ণা, ফলে দেবেন্দ্র গৃহসুখ লাভে বঞ্চিত এবং তারই ফলশ্রুতি " কলিকাতায় পাপ পঙ্কে নিমগ্ন হইয়া দেবেন্দ্র অতৃপ্ত

২২। বঙ্কিম রচনাবলী (প্রথম খণ্ড) – সাহিত্য সংসদ ... পৃঃ ৩১০

বিলাস তৃষ্ণা নিবারণে প্রবৃত্ত হইলেন ।" ২৩ এভাবে ' সুধীরও সত্যনিষ্ঠ প্রভৃতির নিষ্কলঙ্ক' দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্ম সমাজচ্যুত হয়ে দেবীপুরে স্বীয় জমিদারীতে বিলাসব্যসনে, সুরাপানে দিন যাপন শুরু করেন । সেকালে ব্রাহ্ম - ধর্মের প্রকৃত আদর্শ অনুসরণ না করে একশ্রেণীর পুরুষ যে ঐ ধর্মের ভেক ধারণ করে উপার্জনপ্রাপ্তির সুযোগ সন্ধান করেছিল ঔপন্যাসিক দেবেন্দ্রনাথের চরিত্রে সেদিকে ইঙ্গিত করেছেন বলে মনে হয় । বঙ্কিমযুগে ও তার পরেও অনেক ঔপন্যাসিক এ ধরণের পুরুষ চরিত্রের মাধ্যমে ব্রাহ্মধর্মের প্রতিক্রিয়ার স্বরূপ প্রদর্শনের চেষ্টা করেছিলেন । দেবেন্দ্রনাথের এই পরিবর্তিত বাসনাসক্ত চেহারা তাকে পূর্ববর্তী 'বাবু' সমাজের কালোপযোগী প্রতিনিধি রূপেই পরিচিত করিয়েছে । পরস্ত্রী বিধবা কুন্দের প্রতি তার লালসাপূর্ণ আকর্ষণ ও কুন্দকে পাবার জন্য হীরাদাসীকে প্রলুব্ধ করার মধ্যে আমরা আগেকার 'বাবু'দের নারীর প্রতি অশোভন আচরণ ও বাসনাসক্তির অনুভূতি মূলক পরিচয় পাই ।

'কৃষ্ণকান্তের উইল' উপন্যাসের নায়ক গোবিন্দলালও দৈহিক সৌন্দর্যে, চারিত্রিক গুণে ও দাম্পত্য জীবনের সুখ ভোগে নগেন্দ্রনাথের সমপর্যায়ের । এক্ষেত্রেও লেখক এমন আদর্শ চরিত্রের পদস্খলনের চিত্র তুলে ধরে তাঁর নীতি নিষ্ঠ মনোভাব ও মনুষ্যত্বের আদর্শ প্রদর্শনে চেষ্টিত হয়েছেন ।

'রজনী' উপন্যাসের অমরনাথের ক্ষেত্রেও দেখা যায় তার চারিত্রিক ঔদার্য্য যথেষ্ট প্রশংসনীয় । জন্মান্ধ রজনীর হিতকামনায় সে - ই যে মনোহর দাসের সম্পত্তির প্রকৃত উত্তরাধিকারিণী সে বিষয়ের স্থিরতায়

---

২৩ । বঙ্কিম রচনাবলী (প্রথম খণ্ড) — সাহিত্য সংসদ ... পৃঃ ২৭৫

অমরনাথের তৎপরতা এবং দুঃখিনী রজনীকে বিবাহের জন্য প্রস্তাবনা তে চরিত্রটির পরোপকার বৃত্তি প্রকাশিত । প্রথম যৌবনের রূপ-ধাতায় বাল্যপ্রণয়িণী এবং পরস্ত্রী লবঙ্গলতার গৃহে গোপনে প্রবেশ করে যে শাস্তি সে পেয়েছিল সমগ্র জীবন ধরেই তাকে তার প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়েছে । বিষয়লোভে সে রজনীকে বিবাহ ইচ্ছুক নয় । কারণ তার নিজের সম্পদের কোন অপ্রতুলতা ছিল না । কিন্তু দুর্ভাগ্য ক্রমে তার করায়ত্ত সম্পদও তাকে হারাতে হয়েছে । শচীন্দ্র ও রজনী পরস্পরের প্রতি অনুরক্ত জানতে পেরে ' শচীন্দ্রের রজনী শচীন্দ্রকে' দিয়ে সে সংসার ত্যাগ করে । সংগে নিজস্ব ভূসম্পত্তিও রজনীর স্বামীকে দানপত্র লিখে দেয় । তজ্জন্য তার কোন ক্ষোভ বা মনোবেদনার প্রকাশও যেন দেখা যায় না । পুরুষের পক্ষে এতখানি ত্যাগ স্বীকার বাস্তবে দুর্লভ বলেই মনে হয় । এখানেই অমরনাথ আদর্শ লোকের বিশেষ উচ্চস্তরে উন্নীত হয়েছে ।

প্রখ্যাত মনীষী বিপিন চন্দ্র পাল তাঁর দেশ প্রেমের মূলে ' দুর্গেশ নন্দিনী'র প্রভাবের কথা বলেছেন ,- " Durgesh-Nandini quickened my earliest patriotic sentiments." [২৪]
বাস্তবিকই 'বন্দেমাতরম্' মন্ত্রের উদ্গাতা তাঁর জাতীয়তাপ্রধান উপন্যাসের ঐতিহাসিক বা কাল্পনিক চরিত্রগুলির মাধ্যমে যে নবলব্ধ দেশ প্রেম ও জাতীয়তার পরিচয় তুলে ধরতে সুরু করেছিলেন তা সমকালের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে যথেষ্ট প্রভাবিত করেছিল এবং পরবর্তী কালের স্বদেশী আন্দোলনও তার মূল্য স্বীকার না করে পারেনি । সাহিত্য চর্চার মাধ্যমে পরাধীন দেশবাসীর মনে স্বদেশানুরাগের সঞ্চার করা , অতীত ইতিহাসের সংগে পরিচিতি স্থাপন এ যুগের সাহিত্যিকদের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল । বঙ্কিমচন্দ্রে তার পূর্ণতা দৃষ্ট হয় । এ প্রসংগে দেবীপদ

২৪। Memories of my Life and Times (Vol.1) - Bipin Chandra Paul .... Page 227.

ভট্টাচার্যের উক্তি প্রনিধানযোগ্য — " ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকে পাশ্চাত্য শিক্ষা ও স্বাধীনতার আদর্শের সহিত পরিচিত হবার ফলে শিক্ষিত হিন্দু বাঙালীর রোমান্টিক দেশপ্রেম সাহিত্যে প্রকাশ লাভ করে। কাব্যে, নাটকে, উপন্যাসে, সঙ্গীতে তার বহু পরিচয় আছে। বঙ্কিমচন্দ্রের 'দুর্গেশ নন্দিনী'র বীরেন্দ্র সিংহের তেজোদ্দীপ্ত উক্তিতে, 'মৃণালিনী'র হেমচন্দ্রের প্রচেষ্টায় 'চন্দ্রশেখর'এ মীরকাশেমের কার্যকলাপে তার প্রখর দৃষ্টান্ত।" [২৫] ঈশ্বরগুপ্তের কবিতায় যে দেশানুরাগের সংবাদ পাওয়া গেছে, পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রভাবে শিক্ষিত জনমানসে যে পরাধীনতার বেদনাবোধ জাগরিত হচ্ছিল, টডের 'রাজস্থান কাহিনী'তে যে অতীত গৌরবের পরিচয় এদেশবাসী পেয়েছিল, রঙ্গলালের 'পদ্মিনী' উপাখ্যানের 'স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায়' সঙ্গীতে যার আত্মস্ফূর্তি ঘটেছিল ভূদেবের 'অঙ্গুরীয় বিনিময়' এর শিবাজী চরিত্রে যে স্বজাত্য বোধের ও স্বাধীনতাস্পৃহার পরিচয় পাওয়া গেল — বঙ্কিম সে সমস্ত কিছুর সার্থক সমন্বয় করেছেন তাঁর 'মৃণালিনী' উপন্যাসের নায়ক হেমচন্দ্র ও অন্যতম প্রধান পুরুষ চরিত্র পশুপতির চরিত্র মাধ্যমে। মৃণালিনীর প্রকাশকাল ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দ। ঐ সময়েই কবি হেমচন্দ্রের বিখ্যাত 'ভারত সঙ্গীত' রচিত হয়েছে। এর আগেই রাজনারায়ণ বসুর 'স্বদেশ হিতৈষিণী সভা' স্থাপন (১৮৬৫), নবগোপাল মিত্রের পরিচালনায় 'ন্যাশনাল পেপার' প্রকাশ, ১৮৬৭ তে 'হিন্দুমেলা বা 'চৈত্রমেলা' যে হিন্দু জাতীয়তাবাদের পরিচয় দিয়েছে, 'মৃণালিনী'র মধ্যে বঙ্কিম সেই স্বদেশপ্রিয়তার উদ্বোধন ঘটিয়েছেন। 'আনন্দমঠ' 'দেবী চৌধুরাণী' - 'সীতারাম' উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র এই জাতীয়তাবাদের

২৫। উপন্যাসের কথা — দেবীপদ ভট্টাচার্য .... পৃঃ ১৮৪

কথাই বলেছেন । 'কমলাকান্তের দপ্তরে' 'আমার দুর্গোৎসব', 'একটি গীত' - এ এই দেশভাবনারই পরিচয় পাওয়া যায় । ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় যথার্থই বলেছেন — " 'আনন্দমঠের' "বন্দে মাতরম্" সঙ্গীতে যাহার পূর্ণ পরিণতি , 'মৃণালিনী'তে যাহার সূত্রপাত , 'কমলাকান্তে' সেই মাতৃমন্ত্রের প্রথম সার্থক প্রকাশ । বাঙালী জাতির পরাধীনতার সুগভীর ধিক্কার এখানেই বঙ্কিমচন্দ্রের মনে নিদারুণ তীব্রতায় ফুটিয়া উঠিয়াছে । মাতৃপূজার মন্ত্র শিখাইয়া বঙ্কিমচন্দ্র সর্ব্বপ্রথম আমাদের জাতীয়তাবোধ জাগ্রত করিয়া আমাদিগকে সচেতন করিয়াছেন এই 'কমলাকান্তে' । আধুনিক বাঙালীর রাষ্ট্রীয় সাধনার ইতিহাসে প্রকৃতপক্ষে কমলাকান্ত হইতেই আমাদের যাত্রা সুরু ।" [২৬]

'মৃণালিনী' উপন্যাসের নায়ক হেমচন্দ্র যখন বলে — , " যদি এখন এই দেহ পতন করিলে একদিনের তরেও জন্মভূমি দস্যুর হাত হইতে মুক্ত হয় , তবে এইক্ষণে তাহা করিতে প্রস্তুত আছি ।" [২৭] অথবা পশুপতির মুখে যখন উচ্চারিত হয় - 'আমি জননী স্বরূপ জন্মভূমি কখন দেবদ্বেষী যবনকে বিক্রয় করিব না । কেবলমাত্র এই আমার পাপাভিসন্ধি যে , অক্ষম প্রাচীন রাজার স্থানে আমি রাজা হইব যেমন কণ্টকের দ্বারা কণ্টক উদ্ধার করিয়া পরে উভয় কণ্টককে দূরে ফেলিয়া দেয় । তেমনি যবন সহায়তায় রাজ্য লাভ করিয়া রাজা সহায়তায় যবনকে নিপাত করিব । ইহা তে পাপ কি না ? যদি ইহাতে পাপ হয় , যাবজ্জীবন প্রজার মুখানুষ্ঠান করিয়া সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিব" । [২৮] তখন দেশানুরাগের জন্য হেমচন্দ্রের আত্মবিসর্জন

২৬। সাহিত্য সাধক চরিতমালা (২২) — ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়.. পৃঃ ৬০
২৭। বঙ্কিম রচনাবলী (প্রথম খণ্ড) — সাহিত্য সংসদ ... পৃঃ ১৫৩
২৮। ঐ ঐ ঐ ... পৃঃ ২১৭

আকাঙ্ক্ষা ও পশুপতির বিপ্লবাত্মকতার অন্তরালেও দেশপ্রেমের মহান উদ্দেশ্য আমাদের চমৎকৃত করে। এখানেই যে দেশপ্রেমিক পুরুষের চরিত্র সৃষ্টির বীজ বপন করা হোল পরবর্তী যুগের জাতীয় আন্দোলনের কর্মী পুরুষদের নিয়ে লিখিত উপন্যাসে আমরা তার বিশাল মহীরুহাকৃতির পরিচয় পাই। হেমচন্দ্রও পশুপতি বাংলাদেশে দেশপ্রেমিক পুরুষের প্রথম উপস্থাপনা বললে হয়ত অসংগত হবেনা। তবে এদেশে যবনাক্রমণের কালে যে হেমচন্দ্রের মত পুরুষ সুলভ ছিল না তা বলাই বাহুল্য। দীর্ঘকালের পরাধীনতা তারই প্রমাণ। বঙ্কিমের নবশিক্ষালব্ধ কল্পনা যে অতীতে বর্তমানের আকাঙ্ক্ষার পূর্তি সাধনে তৎপর হয়েছিল সে সম্বন্ধে প্রমথনাথ বিশীর অভিমত স্মরণীয় — " সেকালের হিন্দু রাজপুত হেমচন্দ্রের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্রের সমকালের প্রক্ষেপ নাই। হেমচন্দ্র তৎকালীন মানুষ নয়, ইংরেজী শিক্ষিত বাঙালীর মানস প্রতিক্রিয়া; ইংরেজী শিক্ষার ফলে শিক্ষিত সমাজের মধ্যে স্বাধীনতার যে আকাঙ্ক্ষা ধীরে ধীরে উন্মেষিত হচ্ছিল, বঙ্কিমচন্দ্রের কল্পনার আত্মসংকোচে ঘনীভূত হয়ে তা দেখা দিয়েছিল একটি প্রজ্বলন্ত শিখারূপে হেমচন্দ্র সেই মানসাগ্নির শিখা। হেমচন্দ্রে ও হেমচন্দ্রের আচরণে পাই বঙ্কিমচন্দ্রকে ও তার কালের আকাঙ্ক্ষা কে।" [২১]

' আনন্দ মঠ' উপন্যাসের সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ভুক্ত পুরুষ চরিত্রগুলি এই স্বদেশ প্রেমের চরম উৎকর্ষ দেখিয়েছে। দেশমাতৃকার পরাধীনতার শৃংখল মোচনের জন্য নিপীড়িত দুঃস্থ জনগণের জীবনকে দুঃখ মুক্ত করার জন্য এই পুরুষ চরিত্রগুলি সংসার ত্যাগ করে সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করেছে। ভবানন্দের উক্তিতে এদের জীবনের আদর্শে ও উদ্দেশ্য প্রকাশিত — " আমরা সন্ন্যাসী

২১। বঙ্কিম সরণী — প্রমথনাথ বিশী ... পৃঃ ৮৬

যামিনী - জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী । আমরা বলি জন্মভূমিই জননী , আমাদের মা নাই , বাপ নাই , ভাই নাই , বন্ধু নাই - স্ত্রী নাই , পুত্র নাই , ঘর নাই , বাড়ী নাই , আমাদের আছে কেবল সেই সুজলা , সুফলা , মলয়জ সমীরণ শীতলা , শস্য শ্যামলা ।" [৩০] দেশের দুরবস্থার জন্য শাসকের প্রতি এদের বিক্ষোভ বেশ স্পষ্ট — " সকল দেশে রাজার সঙ্গে রক্ষণাবেক্ষণের সম্বন্ধ , আমাদের মুসলমান রাজা রক্ষা করে কই ? ধর্ম্ম গেল , জাতি গেল , মান গেল , কুল গেল , এখনত প্রাণ পর্য্যন্তও যায় । " [৩১] উপন্যাসের পুরুষ চরিত্রের কণ্ঠে এই দেশবন্দনার সুর অভিনব । আবার রাজার বিরুদ্ধে প্রজার বিক্ষোভও নতুন , এক্ষেত্রেও বঙ্কিমের সমকালের ভাবনা প্রতিফলিত হয়েছে । মুসলমান শক্তির বিপর্যয় ও ইংরেজ শক্তির সূচনাকালের এই চিত্র লেখক ঐতিহাসিক দৃষ্টির বলে উপস্থাপিত করেছেন । রবী-দ্রনাথের ' গোরা ' শরৎচন্দ্রের 'পথের দাবী' ও তৎকালীন অন্যান্য ঔপন্যাসিকদের আরও নানা উপন্যাসে আমরা যে দেশ প্রেমিক কর্মী পুরুষদের সাক্ষাৎ পেয়েছি 'আনন্দমঠ' তার সকলেরই প্রেরণা বলা হয়ত অসঙ্গত হবেনা । এ সম্বন্ধে 'বাংলা সাহিত্যের রেখালেখ্য' গ্রন্থে যে মন্তব্য করা হয়েছে তা উদ্ধৃত করা যেতে পারে — " আনন্দমঠ শুধু সমকালীন সমাজের প্রতিচ্ছবি নয় , ভবিষ্যতের বৈপ্লবিক আন্দোলনেরও প্রেরণা ।" [৩২] এ জাতীয় সন্ন্যাসী চরিত্রের মাধ্যমে যুদ্ধ, বীরত্ব , দেশপ্রেম

৩০। বঙ্কিম রচনাবলী (প্রথম খন্ড) — সাহিত্য সংসদ ... পৃঃ ৭২৫

৩১। ঐ ঐ ঐ ... পৃঃ ৭২৭

৩২। বাংলা সাহিত্যের রেখালেখ্য — অলোক রঞ্জন দাসগুপ্ত ও দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় পৃঃ ৩২৫

ইত্যাদি গুণাবলীর প্রদর্শন বাংলা সাহিত্যে পূর্বাপর অনুভূতি বিহীন। সত্যানন্দের মত আদর্শ দেশহিত ব্রতধারী সন্ন্যাসী, ভবানন্দ – জীবানন্দের মত সাংসারিক মোহমুক্ত যুদ্ধে পটু, দেশমাতৃকার উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত প্রাণ, দীক্ষিত সন্তান - সৈনিকের পরিকল্পনা বঙ্কিমের চরিত্র সৃষ্টির মৌলিকতার পরিচায়ক, প্রমথ নাথ বিশী এদের সম্বন্ধে বলেছেন - "তাঁর সন্ন্যাসীরা কেউ নির্গুণ ব্রহ্মের ধ্যানমগ্ন সমাজবিস্মৃত জীব নয়, কিংবা তারা পর পিণ্ড ভোজী অলস অকর্মণ্য সামাজিক পরগাছাও নয়, তারা এক স্বতন্ত্র শ্রেণীর মানুষ, ... ভারতীয় জীবনতন্ত্রের মধ্যে এরা নূতন ধরণের মানুষ। বরঞ্চ এদের মিল পাওয়া যায় ইওরোপের মধ্যযুগীয় সাধু সন্ন্যাসীগণের সঙ্গে। এ যুগের খৃষ্টীয় মিশনারী সম্প্রদায়ের সঙ্গে, বঙ্কিম চন্দ্রের পরবর্তী যুগের রামকৃষ্ণ মিশনের কর্মী সন্ন্যাসীগণের সঙ্গে। ...... এ শ্রেণীর নূতন সন্ন্যাসীর পরিকল্পনা ভারতীয় জীবনতন্ত্রে বঙ্কিমচন্দ্রের একটি মৌলিক দান।" ৩৩

'দেবী চৌধুরাণী' উপন্যাসের ভবানী পাঠক এই দেশহিত ব্রতধারী সন্ন্যাসী সম্প্রদায়েরই যেন আর এক রূপ। সে দস্যু, তার ভয়ে বরেন্দ্রভূমি কম্পমান, কিন্তু তার এই দস্যুবৃত্তির উদ্দেশ্য অতি মহৎ, সে নিজেই এ সম্বন্ধে বলেছে, '' এ দেশে রাজা নাই, মুসলমান লোপ পাইয়াছে। ইংরেজ সম্প্রতি ঢুকিতেছে তাহারা রাজ্য শাসন করিতে জানেও না করেও না। আমি দুষ্টের দমন, শিষ্টের পালন করি।" ৩৪ দুর্দশাগ্রস্থ দেশবাসীদের

৩৩। বঙ্কিম সরণী – প্রমথনাথ বিশী .... পৃঃ ২১২

৩৪। বঙ্কিম রচনাবলী (প্রথম খণ্ড) – সাহিত্য সংসদ ... পৃঃ ৮১১

দুঃখ মোচনের জন্য এই সমুদয় শাস্ত্রজ্ঞব্রাহ্মণ প্রফুল্লকে 'দেবী চৌধুরাণী' রূপে গড়ে তুলেছেন। অসহায় প্রজাবর্গের দুঃখ মোচনের এই প্রয়াস প্রকারান্তরে দেশ হিতৈষণার পরিচায়ক বলা যায়। বঙ্কিম সমকালে শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের 'বিশ্বনাথ' উপন্যাসের নায়ক দস্যু বিশ্বনাথ পরহিতব্রতী পুরুষ। স্বদেশী আন্দোলন নিয়ে রচিত পরবর্তীকালের নানা উপন্যাসেও দেখা যায় দেশের কাজের প্রয়োজনে দেশকর্মীগণ ধনীর ধন লুণ্ঠনে অগ্রণী হয়েছে।

সীতারাম এর চরিত্রেও বীরত্ব, কর্মকুশলতা, রাজ্য পরিচালনায় দক্ষতা, প্রজাবাৎসল্য ইত্যাদি গুণের সঙ্গে স্বদেশপ্রেমের পরিচয়ও লেখক দেখিয়েছেন।

'কমলাকান্তের দপ্তর' এর অন্তর্গত 'আমার দুর্গোৎসব' প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের দেশপ্রেমের প্রকাশ ঘটেছে " চিনিলাম, এই আমার জননী জন্মভূমি -- এই শ্যামময়ী মৃত্তিকারূপিনী - অনন্ত রত্ন ভূষিতা এক্ষণে কালগর্ভে নিহিতা।" [৩৫] আবার 'একটিগীত' অংশে কমলাকান্ত মর্মবেদনা প্রকাশ করেছে " যাহা চাই, তাহা মিলাইল কই ? মনুষ্যত্ব মিলিল কই ? এক জাতীয়ত্ব মিলিল কই ?" [৩৬] এই দেশানুরাগ, বাস্তবে মনুষ্যত্বের অপ্রাপ্তির বেদনাবোধের চরিতার্থ করার জন্যই যেন বঙ্কিম 'আনন্দমঠ', 'দেবী চৌধুরাণী', 'সীতারাম' উপন্যাসে দেশপ্রেমিক, আদর্শ মনুষ্য চরিত্রের পরিচয় তুলে ধরেছেন প্রধান পুরুষ চরিত্র গুলির মধ্যে। তাঁর 'ধর্মতত্ত্ব' প্রবন্ধে বঙ্কিম বলেছেন, 'সর্বভূতের হিতের জন্য সকলেরই স্বদেশরক্ষণ কর্তব্য।' [৩৭]

৩৫। বঙ্কিম রচনাবলী (দ্বিতীয় খণ্ড) – সাহিত্য সংসদ .. পৃঃ ৮০

৩৬। ঐ ঐ ঐ .. পৃঃ ৮৪

৩৭। ঐ ঐ ঐ .. পৃঃ ৬৬০

ঐ সময় 'কৃষ্ণ চরিত্র' রচনার মাধ্যমে আদর্শ পুরুষ চরিত্রের অনুসন্ধান বঙ্কিমের শেষ পর্বের উপন্যাসের পুরুষ চরিত্রে প্রকাশিত হয়েছে। তাই বঙ্কিমের উপন্যাসত্রয়ীর পুরুষেরা স্বদেশপ্রেমে ও আদর্শ মনুষ্যত্বের পরিচয়ে অনন্য সাধারণ।

ঊনবিংশ শতকের উল্লেখযোগ্য ঘটনা নারী জাগরণ। নারী ব্যক্তিত্বের স্বীকৃতি, নারীর প্রতি বিশেষ মর্যাদাবোধ এ যুগের নব জাগরণ আন্দোলনের অন্যতম অভিনব মানসিকতার পরিচয়বাহী। সমাজে বিশেষ মর্যাদার আসনে নারীর অবস্থিতির জন্য সেদিন নারীজাতির প্রচেষ্টা অপেক্ষা পুরুষের সক্রিয়তা অধিক কার্য্যকরী হয়েছিল। এ যুগের সমাজ সংস্কারকেরা নারীর বন্ধন মুক্তির জন্য, নতুন যুগের আলোকে তাদের দীর্ঘদিনের অবরুদ্ধ জীবনকে আলোকোদ্ভাসিত করবার জন্য পথ নির্দেশে ব্যাপৃত হয়েছিলেন। আর সাহিত্যিকেরা তাঁদের সাহিত্য রচনার মাধ্যমে নারীর বন্দনা গানে, নারীর শক্তিকে স্বীকৃতি দানে অগ্রণী হয়েছিলেন। নবযুগের অন্যতম প্রধান কর্মী পুরুষ বঙ্কিমচন্দ্রও তাঁর উপন্যাসের পুরুষ চরিত্রগুলিকে এই নবযুগের বৈশিষ্ট্য বিভূষিত করে নারীর মর্যাদা রক্ষায় তাদের তৎপরতা ও নারীর প্রতি শ্রদ্ধাবোধে উন্মুখ হৃদয়ের অধিকারী রূপে উপস্থিত করেছেন। এদেশের রক্ষণশীল পুরুষ শাসিত সমাজ দীর্ঘ কয়েক শতাব্দী ধরে পুরুষের ক্ষমতা ও প্রতিপত্তিকে প্রাধান্য দিয়ে এসেছে, নারীকে অজ্ঞানতার অন্ধকারে নির্বাসিত রেখে। সে যুগ নারীর দুর্ভাগ্যের যুগ। তখন তার প্রয়োজনীয়তা নির্দেশিত ছিল অন্তঃপুরে পুরুষের ভোগোপকরণ হিসাবেই। কিন্তু পরিবর্তনশীল যুগে, নবতম শিক্ষা ও সংস্কৃতির সংস্পর্শে এসে পুরুষদের মানসিকতা ও দৃষ্টিভংগী পরিবর্তন করতে সচেষ্ট হোল। সমাজে নারী পুরুষের সহধর্ম্মিণী ও সহ কর্ম্মিনীর যোগ্য মর্যাদা ও স্বীকৃতি পেল। বঙ্কিমের উপন্যাসের পুরুষেরা এই পরিবর্তিত মানসিকতার অধিকারী। অতীতের প্রেক্ষাপট থেকে আহৃত পুরুষ চরিত্রে বঙ্কিম তার সমকালের আকাঙ্ক্ষা ও দৃষ্টিভঙ্গীর রূপায়ণে ব্রতী হয়েছিলেন।

" যদি স্ত্রীলোক হও, তবে নিশ্চিন্ত হইয়া নিদ্রা যাও, রাজপুত হস্তে অসিচর্ম থাকিতে তোমাদের পদে কুশাঙ্কুরও বিঁধিবে না।" [৩৮] বিমলাও তিলোত্তমার প্রতি শৈলেশ্বরের মন্দিরে দুর্যোগের রাতে 'দুর্গেশ নন্দিনী'র নায়ক জগৎ সিংহের এই উক্তি ভূদেবের 'অঙ্গুরীয় বিনিময়' এর শিবাজীর বন্দিনী রোশিনারার মর্যাদা রক্ষা ও তার ব্যক্তিত্বের প্রতি শ্রদ্ধাশীলতারই যেন আরও পরিণত রূপ। ঐতিহাসিক বা সেকালের কাল্পনিক চরিত্র সকলেই এই অভিনব মানসিকতার পরিচয় দিয়েছে।

'রাজসিংহ' উপন্যাসে দেখা যায়, রূপনগরের রাজকন্যা রাজসিংহের 'দেখবার যোগ্য' তসবির দেখেই তার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে, বাদশাহ আলমগীরের তস্বির পদাঘাতে চূর্ণ করায় যে জটিলতার সৃষ্টি হয়েছিল, রাজসিংহ অনিবার্য্য ভাবেই তাতে জড়িত হয়ে পড়লেন। এরই ফলশ্রুতি মেবারের রাণার সংগে আলমগীরের সংগ্রাম। সেখানেও রাণা এক রাজপুত কন্যার সম্ভ্রম রক্ষার প্রশ্নেই প্রধানতঃ বাদশাহের সেনাবাহিনীর সংগে পার্বত্য রুদ্ধপথে বিরোধে লিপ্ত হন। চঞ্চল কুমারীকে তিনি তখনও দেখেননি, সুতরাং তার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে রাণা এই সংগ্রামে ব্রতী হয়েছিলেন তা বলা যায় না। পরে অবশ্য চঞ্চল কুমারীর সৌন্দর্য্য, বীরত্ব ও সাহসিকতা রাণাকে মুগ্ধ করে তবুও তিনি রাজকন্যাকে তার প্রতি অনুরক্ত জেনেও তার পিতার অনুমতি না নিয়ে বিবাহ করেন নি। বিপন্না চঞ্চল কুমারীকে উদ্ধার করার পর তিনি অনায়াসে তাকে বিবাহ করতে পারতেন কিন্তু তা না করে বিক্রমদেব সোলাঙ্কির অনুমতি প্রার্থনা করে অপেক্ষা করেছেন। চঞ্চলের পিতা রাণার সংগে নিজ কন্যার বিবাহে প্রথমে অমত প্রকাশ করলে রাজসিংহ যে আচরণ করেছেন তা একজন আদর্শ রাজপুত বীরেরই উপযুক্ত। বিক্রমদেবের প্রতি কোনরকম

৩৮। বঙ্কিম রচনাবলী (প্রথম খণ্ড) সাহিত্য সংসদ ... পৃঃ ৫৩

অসৌজন্যমূলক উক্তি বা ব্যবহার প্রদর্শন না করে রণা চন্দন কুমারীকে বলেছেন – " কিন্তু তোমার পিতার আশীর্বাদ ব্যতীতও তোমাকে বিবাহ করিব না । সে আশীর্বাদের ভরসা আমি একেবারে ত্যাগ করিতেছি না ।" [৩১] এ ছাড়া তিনি আরও বলেছেন – যতদিন পর্য্যন্ত রাজকন্যার পিতার আশীর্বাদ লাভের জন্য তিনি বিবাহে বিলম্ব করবেন ততদিন চন্দনকুমারী রণার অন্তঃপুরে যথোচিত মর্য্যাদা সহ থাকতে পারবেন । " ততদিন তুমি আমার অন্তঃপুরে থাক । মহিষীদিগেরন্যায় তোমার পৃথক রেউল হইবে । মহিষীদিগের ন্যায় তোমারও দাস - দাসী পরিচর্য্যার ব্যবস্থা করিব । আমি প্রচার করিব যে , অল্পদিনের মধ্যে তুমি আমার মহিষী হইবে । এবং সেই বিবেচনায় সকলেই তোমাকে মহিষীদিগের ন্যায় মহারাণী বলিয়া সম্বোধন করিবে । কেবল যতদিন না তোমার সঙ্গে আমার যথাশাস্ত্র বিবাহ হয় , ততদিন আমি তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিব না ।'' [৪০] রাজসিংহের এই উক্তি তাঁর গভীর রাজনৈতিক দূরদর্শিতা ও নারীর মর্য্যাদা সম্বন্ধে সচেতনতার পরিচায়ক ।

উপন্যাসের অন্যতম প্রধান চরিত্র মবারকও এজাতীয় গুণের অধিকারী । পর্ব্বত দুর্গপথে বাদশাহের সেনাপতি হিসাবে চন্দনকুমারীর সংগে কথোপকথন কালে নারীর প্রতি তাঁর শ্রদ্ধাবোধের পরিচয় পাওয়া যায় । ঔপন্যাসিক তাঁর সম্বন্ধে বলেছেন – " কিন্তু মবারক সে ইতর প্রকৃতির মনুষ্য ছিলেন না । তিনি রাজসিংহের ন্যায় যথার্থ বীরপুরুষ । তিনি বলিলেন , " মা আত্মঘাতিনী কেন হইবেন ? আপনি যদি যাইতে না চাহেন , তবে

৩১। বঙ্কিম রচনাবলী (প্রথম খন্ড) – সাহিত্য সংসদ ... পৃঃ ৬৬২

৪০। ঐ ঐ ঐ ... পৃঃ ৬৬২

আমাদের সাধ্য কি আপনাকে লইয়া যাই ? স্বয়ং দিল্লীশ্বর উপস্থিত থাকিলেও আপনার উপর বল প্রকাশ করিতে পারিতেন না – আমরা কোন্ ছার"? [৪১]

উভয় সেনাদলের মধ্যে চঞ্চলকুমারী অসি উত্তোলন করে দণ্ডায়মান হওয়ায় মবারক যুদ্ধ ত্যাগ করে প্রত্যাবর্তনে উদ্যোগী হলে চঞ্চল কুমারী যখন বলেন " আঘাকে লইয়া যাইবার জন্য আপনাদের দিল্লীশ্বর পাঠাইয়া দিয়াছেন । আঘাকে যদি লইয়া না যান , তবে বাদশাহ কি বলিবেন ?" [৪২] তখন নীতিনিষ্ঠ মবারক নির্ভীক কণ্ঠে প্রত্যুত্তর দেন , " বাদশাহের বড় একজন আছেন।উত্তর তাঁহার কাছে দিব । ..... মবারক আলি ইহলোকে কাহাকেও ভয় করেন । ঈশ্বর আপনাকে কুশলে রাখুন - আমি বিদায় হইলাম", [৪৩] এখানেও চরিত্রটি প্রশংসার যোগ্য ।

নারীর মর্যাদা সম্বন্ধে সচেতনতার পরিচয় 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসে মীরকাসেম চরিত্রেও দেখা গেছে । নবাবের ভৃত্যবর্গ দলনী ভ্রমে যখন প্রতাপের মুঙ্গেরের বাড়ী থেকে শৈবলিনীকে নবাবের অন্তঃপুরে নিয়ে উপস্থিত করেছিল তখন নবাব অনায়াসে সেই সুন্দরী রমনীকে নিজের ভোগের প্রয়োজনে অন্তঃপুরে অবরুদ্ধ করতে পারতেন । ঐতিহাসিক তথ্য অনুযায়ী বহু নবাবের ক্ষেত্রেই এমন ঘটনা স্বাভাবিক ছিল । কিন্তু মীরকাসেম শৈবলিনীর সংগে আচরণে ও কথা বার্তায় যে সৌজন্যের পরিচয় দিয়েছেন, প্রতাপের উদ্ধারের জন্য শৈবলিনীকে যেভাবে সহায়তা করেছেন তা যথার্থই আদর্শ নবাবের উপযোগী । একজন সামান্যা

৪১। বঙ্কিম রচনাবলী (প্রথম খণ্ড) – সাহিত্য সংসদ ... পৃঃ ৬৫২
৪২। ঐ ঐ ঐ ... পৃঃ ৬৫৩
৪৩। ঐ ঐ ঐ ... পৃঃ ৬৫৩

নারীর কথায় বিশ্বাস স্থাপন করে তার স্বামীর (প্রতাপ) উদ্ধারের জন্য নবাবের প্রচেষ্টা সত্যই প্রশংসনীয় । এই সঙ্গে দলনী বেগমের উদ্ধার কার্য্য জড়িত ছিল বলেই যে নবাব প্রতাপের উদ্ধারের জন্য এতটা সচেষ্ট হয়েছিলেন তা মনে হলেও নবাবের গুণাবলী ঔপন্যাসিক যেভাবে চিত্রিত করেছেন তাতে কেবলমাত্র স্বার্থ সম্পর্ক যুক্ত বলে তাকে অভিহিত করা যায় না ।

ঐতিহাসিক কালগত দূরত্বে অবস্থিত পুরুষ চরিত্রে কেবলমাত্র যে এই নারীর প্রতি সশ্রদ্ধ মনোভাব দেখা গেছে তা নয় । সমকালীন সমাজ পরিবেশ থেকে আহৃত পুরুষ চরিত্রও এই গুণের অধিকারী । ' বিষবৃক্ষে'র নায়ক নগেন্দ্রনাথের সর্বসুখ সম্পন্ন জীবনে কুন্দ নন্দিনীর সঙ্গে সাক্ষাৎ যে বিপর্যয়ের বীজ বপন করে কালক্রমে শাখা - প্রশাখায় পল্লবিত করেছিল নগেন্দ্র যে সেই বিপর্যাস্ত অবস্থাতেও পাঠকের সমবেদনা লাভে সক্ষম হয়েছেন তাঁর চরিত্রের গুণাবলীই তার কারণ , কুন্দের পিতার মৃত্যু রাতে তার বহুকাল মৃতা জননী স্বপ্নে দর্শন দিয়ে নগেন্দ্রকে তার জীবনের অমঙ্গলের কারণরূপে নির্দেশ করে সাবধান করেছিলেন । কিন্তু পরবর্তী ঘটনা দেখে মনে হয় কুন্দ সম্বন্ধে নগেন্দ্রের প্রতিও ঐ ধরণের সাবধানবানী প্রযোজ্য ছিল । পিতার মৃত্যুর পর অনাথিনী কুন্দকে আশ্রয়দানের মধ্যে অসহায়া নারীর প্রতি নগেন্দ্রের কর্তব্যবোধের পরিচয় পাওয়া যায় । যে যুগে ধনাঢ্য ব্যক্তিদের বিলাস-গৃহে রক্ষিতা রাখার প্রথা ছিল , নারীরা পুরুষের ভোগবাসনা চরিতার্থের উপায় স্বরূপ ব্যবহৃত হোত , সুন্দরী কুল কামিনীদের ধর্ম্ম নষ্ট করাটাই তথাকথিত 'বাবু'দের নিত্য রীতি ছিল-সে যুগে নগেন্দ্রনাথ অনাথিনী কুন্দকে নিজের ভোগের প্রয়োজনে ব্যবহৃত না করে তার যথারীতি বিবাহ দিয়েছেন , এখানেই উপন্যাসে 'বাবু' সমাজ থেকে প্রগতিশীল মনোভাব যুক্ত পুরুষের চেহারা সূচিত হোল । কুন্দের অকাল বৈধব্যের পর তার প্রতি নিজের আসক্তিকে সংযত করার জন্য নগেন্দ্রনাথের প্রয়াস বড় বেদনাদায়ক অবশেষে নিজেকে সংযত করতে ব্যর্থ হয়ে স্ত্রী সূর্য্যমুখীর

উদ্যোগে তাকে বিধবা বিবাহ করে ধর্মপত্নীর মর্যাদাদানে প্রয়াসী হয়েছেন, এ পর্যন্ত কুন্দ নন্দিনীর প্রতি নগেন্দ্রের আচরন কোথাও অশোভন ও অযৌক্তিক নয়। তবে কুন্দের প্রতি তাঁর আসক্তি যে তার সুখের দাম্পত্য জীবনে অশান্তির দাবদাহ সৃষ্টি করেছে সে সম্বন্ধেও তিনি অচেতন। সূর্যমুখীর গৃহত্যাগের পরে কুন্দের প্রতি নগেন্দ্র নাথের উপেক্ষা ও অনাদর তাঁর তীব্র মানসিক যন্ত্রণারই প্রকাশক। এখানেই চরিত্রটির স্বাভাবিকতা রক্ষিত হয়েছে।

পুরুষের এই অসংযত ভোগবাসনার প্রশ্রয়ের মর্মান্তিক পরিণতির অপর চিত্র দেখতে পাই গোবিন্দলাল চরিত্রে। নগেন্দ্রনাথ কুন্দের প্রতি কোন অবিচার না করে তাকে আইন সম্মত বিধবা বিবাহে ধর্ম পত্নী রূপে গ্রহণ করেছেন, কিন্তু গোবিন্দলাল রোহিনীর প্রতি নিদারুণ অবিচার করেছেন। তাকে নিয়ে দেশান্তরী হলেও বিবাহিতা স্ত্রীর মর্যাদা দেননি। কুন্দ ও রোহিনীর চরিত্রের বৈপরীত্য এখানে অনেকটা কার্য্যকরী হলেও 'কৃষ্ণকান্তের উইল' উপন্যাসের নায়কের দায়িত্ব ও এক্ষেত্রে কম নয়। সেজন্যই তাঁর পরিণতিও অধিকতর বেদনা দায়ক। নগেন্দ্র সূর্যমুখীর সংগে পুনরায় মিলিত হতে পেরেছিলেন। কিন্তু গোবিন্দলালের পক্ষে ভ্রমরকে নিয়ে সংসারজীবনে পুনঃ প্রবেশ আর সম্ভব ছিল না। ভ্রমরকে পুনরায় লাভ করাও আর তাঁর ভাগ্যে ঘটেনি।

রোহিনীর প্রগলভা চরিত্র কুন্দের মত নতশির, অস্ফুট-বাচ', নয় বলেই তার প্রতি গোবিন্দলালের আসক্তি পদস্খলনের নিম্নতম সোপানে তাকে টেনে নিয়ে গেছে। কুন্দের মত বিবাহিতা স্ত্রীর মর্যাদালাভ রোহিণীর ভাগ্যে জোটেনি। বিধবা বিবাহ তখন আইনতঃ সিদ্ধ এবং পুরুষের বহুবিবাহ তখনও প্রচলিত। কিন্তু জমিদার কৃষ্ণকান্ত রায়ের বিপুল ও আদরের ভ্রাতুষ্পুত্রের পক্ষে এবং ভ্রমরের মত স্ত্রীর স্বামীর পক্ষে 'বিধবা বিবাহ' করা যে

সম্ভব নয় সেটা গোবিন্দলাল জানতেন, তাই তাকে তৎকাল প্রচলিত 'বাবু'দের পথ অনুসরণ করতে হয়েছিল। অথচ গোবিন্দ লালের জীবনেও নগেন্দ্রের মত সুখের অবধি ছিল না। তিনি সুপুরুষ হলেও কৃষ্ণা স্ত্রী ভ্রমরের প্রতি তার কোন অনাদর বা উপেক্ষার মনোভাব উপন্যাসের প্রারম্ভে দেখা যায় নি। রোহিনীর প্রতি তার প্রথমিক মনোভাব একজন সহৃদয়, আদর্শ পুরুষের অনুরূপ। কলুষতার কোন ইঙ্গিত ঔপন্যাসিক সেখানে দেননি।—" তখন গোবিন্দলাল উদ্যান হইতে গৃহাভিমুখে চলিলেন — যাইবার সময়ে দেখিতে পাইলেন যে, তখনও রোহিনী ঘাটে বসিয়া আছে।

এতক্ষণ অবলা একা বসিয়া কাঁদিতেছে দেখিয়া, আহার একটু দুঃখ উপস্থিত হইল। তখন তাঁহার মনে হইল যে, এ স্ত্রীলোক সচ্চরিত্র হউক, দুশ্চরিত্র হউক, এও সেই জগৎ পিতার প্রেরিত সংসার পতঙ্গ — আমিও তাঁহার প্রেরিত সংসার পতঙ্গ, অতএব এও আমার ভগিনী। যদি ইহার দুঃখ নিবারণ করিতে পারি তবে কেন করিব না?"[৪৪]
রোহিনীর চরিত্র সম্বন্ধে গোবিন্দলাল পূর্বজ্ঞাত হয়েও যে তাকে সমবেদনা জানাতে গিয়েছেন, এখানে সেটা তাঁর চরিত্রের ঔদার্য বলেই মনে হয় কিন্তু এখানেই তাঁর চরিত্রে আসন্ন পতনের বীজবপন করা হোল, যা কালক্রমে পল্লবিত হয়ে তার জীবনকে সম্পূর্ণ ধ্বংসের পথে নিয়ে গেছে।

উপন্যাসের অপর আকর্ষণীয় চরিত্র জমিদার কৃষ্ণকান্ত রায়। উপন্যাসে তাঁর উপস্থিতি খুব সামান্যই। কিন্তু সেই স্বল্প পরিচয়েই তাঁর প্রখর ব্যক্তিত্ব, নীতি নিষ্ঠা, বিষয় বুদ্ধি, পিতৃহীন ভ্রাতুষ্পুত্রের প্রতি গভীর স্নেহ ও তার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা আমাদের চমৎকৃত করে। উইলের

৪৪। বঙ্কিম রচনাবলী (প্রথম খণ্ড) — সাহিত্য সংসদ ... পৃঃ ৫৪১

সর্বশেষ পরিবর্তনে তিনি গোবিন্দলালকে কপর্দকশূন্য করে তার স্ত্রী ভ্রমরকে তার অংশের সমস্ত সম্পত্তির অধিকারী করে যান , এতে গোবিন্দলালের চরিত্র সংশোধনের প্রয়াস এবং সেই সঙ্গে ভ্রমরের ভবিষ্যতের স্বাচ্ছন্দের জন্য হিত কামনার পরিচয় পাওয়া যায় ।

রোহিনীর বিচার প্রসঙ্গে যখন তিনি বলেন — ' আমার কাছে আবার থানা ফৌজদারি কি ? আমিই থানা , আমিই মেজেস্টর , আমিই জজ ।" [৪৫] তখন তার মধ্যে তৎকালীন দোর্দণ্ড প্রতাপশালী জমিদারের চেহারা ফুটে ওঠে ।

'দেবী চৌধুরাণী' উপন্যাসের নায়ক ব্রজেশ্বরের পিতা হরবল্লভ বাস্তববুদ্ধি সম্পন্ন ক্ষমতাশালী জমিদার পুরুষের অপর নিদর্শন । বিনাদোষে পুত্রবধূ প্রফুল্লকে পরিত্যাগ করিয়ে , পুত্রের পুনর্বিবাহ দিয়ে তিনি তৎকালীন শ্বশুর জাতীয় ব্যক্তির অমানবিক নিষ্ঠুরতার দিকটি প্রকাশ করেছেন । অসহায়া পুত্রবধূর জীবিকা নির্বাহের উপায় স্বরূপ চুরি ডাকাতি - ভিক্ষা ইত্যাদি অবলম্বন করার নির্দেশ দিতেও তার বিবেকে বাধেনি ।

দেবী সিংহের খাজনার পাওনা মেটাতে না পারায় হরবল্লভকে গ্রেপ্তারের জন্য পরওয়ানা বের হলে পিতাকে রক্ষা করার জন্য ব্রজেশ্বর দেবী চৌধুরাণীর কাছ থেকে ধার নেওয়া প্রসঙ্গে যখন বলে যে ডাকাতি করে উপার্জিত ঐ পাপের ধন নেওয়া তার অভিমত নয় , তখন হরবল্লভের উত্তর তার প্রখর বাস্তব বুদ্ধির পরিচায়ক — " টাকাটা নেব নাত কি জাটকে যাব নাকি ? আর জপতপের টাকাই বা কার কাছে পাব ? সে আপত্তি

৪৫। বঙ্কিম রচনাবলী (প্রথম খণ্ড) — সাহিত্য সংসদ ... পৃঃ ৫৫৭

করে কাজ নাই ।" [৪৬]

এরপর আবার টাকা ফেরৎ দেবার সময় ও স্থান সম্বন্ধে অবহিত হয়ে তিনি অভিসন্ধি করেন ,— "হাঁ:,সে বেটীর আবার টাকা শোধ দিতে যাবে । বেটীকে সিপাহী এনে ধরিয়ে দিলেই সব গোল মিটে যাবে । বৈশাখী সপ্তমীর দিন সন্ধ্যার পর কাপ্তেন সাহেব পল্টনশুদ্ধ তার বজরায় না উঠে ত আমার নাম হরবল্লভই নয় । তাকে আর আমার কাছে টাকা নিতে হবে না ।" [৪৭] উক্তিটির মধ্য দিয়ে চতুরতায়,কূট কৌশলে চরিত্রটি যেন 'আলালের ঘরের দুলালে'র ঠকচাচার উত্তরসূরী হিসাবে উপস্থিত হয়েছে । বংশ মর্যাদায় এবং সামাজিক পরিচয়ে পার্থক্য থাকলেও কূট কৌশলী চাতুর্য্য আলে এরা সমধর্মী ।

বঙ্কিম উপন্যাসের পুরুষের কেউই দরিদ্র নয় , একথা আগেই বলা হয়েছে । সুতরাং এদের জীবনের সমস্যায় অর্থনৈতিক সংকটের সম্ভাবনা বিশেষ নেই । রাজনীতি সম্বন্ধেও ঐতিহাসিক চরিত্রগুলি ছাড়া কেউ সমস্যা পীড়িত নয় । সুতরাং এদের প্রত্যেকের জীবনের সমস্যা দেখা দিয়েছে প্রধানত: নারীরূপ মুগ্ধতা বা নারী প্রেমকে কেন্দ্র করে ।

তবে নারীরূপ মুগ্ধতার পরিণামে পুরুষের জীবনে অর্থনৈতিক সংকটের নিদর্শন পাওয়া যায় 'কৃষ্ণকান্তের উইল' উপন্যাসের নায়ক গোবিন্দলালের চরিত্রে । জমিদার পুরুষের জীবিকার্জনের প্রবণতা তখনও দেখা যায় না । তাই রোহিনী হত্যার পরবর্তী পলাতক জীবনে জমিদার কৃষ্ণকান্ত রায়ের ভ্রাতুষ্পুত্র গোবিন্দলাল ভিক্ষান্নে উদরপূর্তি করেছেন । এরপর ধৃত হয়ে

৪৬। বঙ্কিম রচনাবলী (প্রথম খণ্ড) — সাহিত্য সংসদ ... পৃ: ৮৪২

৪৭। ঐ ঐ ঐ ... পৃ: ৮৪২-৮৪৩

খালাস পাবার পরে কলকাতায় এসে চরম অর্থসংকটের সম্মুখীন হয়েই তিনি সুদীর্ঘ ছয় বছর পরে পরিত্যক্ত স্ত্রী ভ্রমরকে চিঠি লেখেন ,— " আমি এখন নিঃস্ব , তিন বৎসর ভিক্ষা করিয়া দিনপাত করিয়াছি , তীর্থস্থানে ছিলাম , তীর্থস্থানে ভিক্ষা মিলিত । এখানে ভিক্ষা মিলে না — সুতরাং আমি অন্নাভাবে মারা যাইতেছি ।

আমার যাইবার এক স্থান ছিল — কাশীতে মাতৃক্রোড়ে । মার কাশী প্রাপ্তি হইয়াছে — বোধহয় তাহা তুমি জান । সুতরাং আমার আর স্থান নাই , অন্ন নাই ।

তাই , আমি মনে করিয়াছি , আবার হরিদ্রাগ্রামে এ কালামুখ দেখাইব — নহিলে খাইতে পাই না । যে তোমাকে নিরপরাধে পরিত্যাগ করিয়া পরদার নিরত হইল , স্ত্রী হত্যা পর্যান্ত করিল , তাহার আবার লজ্জা কি ? যে অন্নহীন , তাহার আবার লজ্জা কি ? আমি এ কালামুখ দেখাইতে পারি । কিন্তু তুমি বিষয়াধিকারিনী — বাড়ী তোমার আমি তোমার বৈরিতা করিয়াছি — আমায় তুমি স্থান দিবে কি ? পেটের দায়ে তোমার আশ্রয় চাহিতেছি দিবে না কি ?" [৪৮] এই সুদীর্ঘ পত্রে গোবিন্দলালের যে অনুশোচনা প্রকাশ পেয়েছে তার মূলে রয়েছে তার অন্নাভাব জনিত ক্লেশ । প্রাক্ বঙ্কিম যুগের রচনা 'চন্দ্রমুখীর উপাখ্যান' এ দেখা গেছে নায়ক হেমচন্দ্র স্ত্রী চন্দ্রমুখীর সৎ পরামর্শ উপেক্ষা করে , স্ত্রী র প্রতি দায়িত্ব শূন্য হয়ে , চাকুরীর সন্ধানে যাচ্ছে এই মিথ্যা আশ্বাস দিয়ে বন্ধু বান্ধবদের সঙ্গে দেশভ্রমণে বেরিয়েছিল । এরপর নীতি জ্ঞানহীন , বাসনাসক্ত ইয়ার বন্ধুদের প্ররোচনায় যাবতীয় অর্থ অপব্যয় এরপর সর্বস্বান্ত হয়ে জগন্নাথে কপর্দক শূন্য , বন্ধু পরিত্যক্ত অবস্থায় ভিক্ষান্নে জীবনধারন করেছিল ।

৪৮। বঙ্কিম রচনাবলী (প্রথম খণ্ড) — সাহিত্য সংসদ ... পৃঃ ৮০০

বঙ্কিমের গোবিন্দলাল চরিত্রেও দেখা যায়, তার চরিত্র সংশোধনের জন্য মৃত্যুকালে কৃষ্ণকান্ত রায় ভ্রমরকে সমস্ত বিষয়ের অধিকারিণী করায়, স্ত্রীর সম্পত্তিতে জীবিকা নির্বাহে অনিচ্ছুক বলে তিনি অর্থ উপার্জনের মিথ্যা অজুহাতে সাধ্বী স্ত্রী ভ্রমরকে পরিত্যাগ করে দেশ-ভ্রমী হয়েছিলেন। এরপর ঘটনা বিপাকে আর্থিক ক্লেশের সম্মুখীন হলে কোনও অর্থিক শুভের পথ অনুসন্ধান না করে ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করেছেন। যুগগত পার্থক্য সত্ত্বেও লেখক দ্বয়ের আদর্শবাদিতা ও নীতিবোধের প্রাবল্যই যেন হেমচন্দ্র ও গোবিন্দলাল চরিত্র দুটি চিত্রণে কার্য্যকরী হয়েছিল।

ঘটনাবিপাকে জমিদার বাড়ীর ছেলের জীবনে এই যে অর্থক্লেশ দেখা দিয়েছে, এর মূলেও রয়েছে রমনীরূপ মুগ্ধতায় হিতাহিত জ্ঞান শূন্যতা ও আত্মমর্যাদাবোধ বিনষ্টি।

বঙ্কিমের উপন্যাসে কোথাও পুরুষ নারীর প্রতি আকৃষ্ট, কোথাও বা পুরুষের প্রতি দেখা দিয়েছে নারীর আকর্ষণ, কখনও এই আকর্ষণ একমুখী কখনও বা পরস্পরিক আকর্ষণ এদের জীবনে জটিলতার সৃষ্টি করেছে। প্রেম সংকট ছাড়া অপর কোনও সমস্যার চিত্র বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে তেমন বিশেষ দেখা যায়নি। 'বাবু' চরিত্রেও আমরা এই প্রেম সমস্যার চিত্র পাইনা। ভূদেবের 'অঙ্গুরীয় বিনিময়' থেকেই পুরুষের জীবনে প্রেম সমস্যার জটিলতা দেখা গেছে, বঙ্কিমের হাতে তার বৈচিত্র্যের সন্ধান পাওয়া গেল। ঐতিহাসিক, কাল্পনিক, সামাজিক - সব পুরুষই জীবনে প্রেম সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন। কারও ক্ষেত্রে মিলনে সে সমস্যার সুষ্ঠু সমাধা ঘটেছে, কারও পক্ষে আবার বিচ্ছেদে সম্বল হয়েছে বেদনার অশ্রুরাশি, কোথাও বা মদন দেবতার পুষ্পবান বিষবাণে বৃথা-চরিত হয়ে পুরুষের মৃত্যুর কারণ হয়েছে। এই প্রসঙ্গে প্রমথনাথ বিশীর মন্তব্য উদ্ধৃত করা যেতে পারে - " রমনী

রূপের দাবানলে বঙ্কিমচন্দ্রের সমস্ত উপন্যাস উত্তপ্ত , কোথাও সে দাহ মৃদু , কোথাও সহনাতীত , অনেক স্থলেই ভস্মসার ।.... ওসমান , পশুপতি , নগেন্দ্রনাথ , প্রতাপ , গোবিন্দলাল , সীতারাম নামাবলী অন্তর্হীন । এদের মধ্যে ওসমান ও প্রতাপের মত যারা খাঁটি সোনা তারাই শুধু দাহে উজ্জ্বলতর ।" [৪৯] পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রভাবে সেদিন এদেশের জীবনচর্যার বিভিন্নক্ষেত্রে যে ভাঙন ও সংশয় দেখা দিয়েছিল , সনাতন রীতি নীতি ঐতিহ্যের প্রতি অনাস্থা , যৌথ পরিবার ভিত্তিক জীবনে ভাঙনের সূত্রপাত , নাস্তিকতা বা স্বধর্মত্যাগ , জাতিভেদের বিরোধিতা , ব্রাহ্মধর্মের প্রবর্তনে প্রথাগত ধর্মীয় আচার - আচরণে অনাস্থা ইত্যাদি সে সব কিছুর সমস্যার চিত্ররূপ বঙ্কিম উপন্যাসে পরিলক্ষিত হয় না । তাঁর যুগের কেউ কেউ এবং পরবর্তী কালে অনেকে উপন্যাসে এই সব সমস্যাপীড়িত পুরুষের চেহারা তুলে ধরেছেন। বঙ্কিম তাঁর নীতি নিষ্ঠ মন নিয়ে মনুষ্যত্বের আদর্শ সন্ধানেই তৎপর ছিলেন এবং তার পুরুষেরা সেই আদর্শেরই পরিচয়বাহী ।

জীবনের প্রেম সমস্যা সমাধানেও বঙ্কিমের পুরুষেরা সেই মনুষ্যত্বের আদর্শকেই প্রদর্শন করে গেছেন । ' আনন্দমঠ' উপন্যাসে কল্যাণীর রূপমুগ্ধ সন্ন্যাসী ভবানন্দের পদস্খলনের জন্য ঔপন্যাসিক আক্ষেপ করে বলেছেন — " হায় রমনী রূপলাবণ্য । ইহ সংসারে তোমাকেই ধিক্" । [৫০] এই ধিক্কার সমস্ত পুরুষ চরিত্রের জীবনে বিপর্যয়ের মূলে কার্যকরী হলেও এর সঙ্গে পুরুষের প্রতি নারীর প্রণয়ানুরাগও মিশ্রিত রয়েছে বলা যায় ।

'দুর্গেশ নন্দিনী' উপন্যাসের নায়ক জগৎ সিংহের জীবনে

৪৯। বঙ্কিম সরণী [redacted] — প্রমথনাথ বিশী .. পৃঃ ৮৫

৫০। বঙ্কিম রচনাবলী (প্রথম খণ্ড) — সাহিত্য সংসদ .. পৃঃ ৭৭৪

বিপত্তি মুক্ত শৈলেশ্বর মন্দিরে গুরুতে পরিচিতা , শত্রুকন্যা তিলোত্তমার প্রতি প্রথম দর্শনেই প্রণয়াকৃষ্ট হওয়ায় , তাঁর জীবনের দ্বিতীয় সমস্যা নবাব কতলু খাঁর গৃহে বন্দী অবস্থায় অসুস্থতাকালে পরিচর্যারত নবাব পুত্রী আয়েষার তাঁর প্রতি প্রণয়ানুরাগ । ' এই বন্দী আমার প্রাণেশ্বর'—[৫১] আয়েষার এই স্পষ্ট , নির্ভীক স্বীকৃতি জগৎ সিংহ ও ওসমানের মধ্যে অকারণ বৈরীতার সৃষ্টি করে । জগৎ সিংহ আয়েষার প্রণয়াকাঙ্ক্ষী মন এ স্বীকৃতির পরেও ওসমান জগৎ সিংহকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করেন । কারণ ওসমানের জীবনেও সমস্যা আয়েষার প্রতি তার প্রেমাসক্তি । " আমরা পাঠান — অন্তঃকরণ প্রজ্বলিত হইলে উচিতানুচিত বিবেচনা করিনা , এই পৃথিবী মধ্যে আয়েষার প্রণয়াকাঙ্ক্ষী দুই ব্যক্তির স্থান হয়না , একজন এইখানে প্রাণত্যাগ করিব ।" [৫২] ওসমানের এই বলিষ্ঠ উক্তি তার জীবনে প্রেম গভীরতার সমস্যার সংবাদ দেয় ।

' কপাল কুণ্ডলা' উপন্যাসের নায়ক নবকুমারের পরিত্যক্তা, বিধর্মী প্রথমা পত্নী পদ্মাবতী ওরফে মতিবিবির স্বামীর প্রতি নবানুরাগের সঞ্চার নবকুমার কপালকুণ্ডলার দাম্পত্য জীবনের সুখের সম্ভাবনা বিনষ্ট করেছে । মতিবিবি দীর্ঘকাল স্বামীগৃহ ত্যাগিনী , নবাবের অন্তঃপুরে বিলাস - ব্যসনে অভ্যস্তা । আকস্মিকভাবে সপ্তগ্রামের পথে কপাল কুণ্ডলা সহ নবকুমারকে দেখে তার মধ্যে ঈর্ষা ও হতাশার পীড়ন সুরু হয় । এই ঈর্ষাবিষের দংশন জ্বালায় সে কপাল কুণ্ডলার প্রতি নবকুমারের অবিশ্বাস সৃষ্টি করিয়ে , তাকে বিভ্রান্ত করতে চেয়েছে । তারপর কাপালিকের সহায়তায় কার্যোদ্ধারে ব্রতী হয়েছে । পরিণতিতে দেখা যায় , নবকুমার ও কপাল কুণ্ডলার সলিল সমাধি , আর

৫১। বঙ্কিম রচনাবলী (প্রথম খণ্ড) — সাহিত্য সংসদ ... পৃঃ ১২৩

৫২। ঐ ঐ ঐ ... পৃঃ ১২৮

শ্রীবিবি নিজেও অতৃপ্ত প্রেমের দাহে জর্জরিত হয়েছে ।

কপাল কুণ্ডলার প্রতি নবকুমারের প্রেম যে কতখানি গভীর ও অকপট ছিল তা নবকুমারের গৃহে কপালকুণ্ডলার আদর স্বীকৃতিতে তার উল্লসিত হওয়া , শ্রীবিবির নব্যপ্রণয় ও ধন সম্পদের লোভ প্রদর্শন কে দৃঢ়তার সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করার মধ্যেই সুপ্রকাশিত । জীবনের চরম মুহূর্তে তার বেদনার্ত উক্তির মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে – " তুমি কি জানিবে মৃন্ময়ী , তুমি ত কখনও রূপ দেখিয়া উন্মত্ত হও নাই" – বলিতে বলিতে নবকুমারের কণ্ঠস্বর যাতনায় রুদ্ধ হইয়া আসিতে লাগিল । " তুমি ত কখনও আপনার হৃৎপিণ্ড আপনি ছেদন করিয়া শ্মশানে ফেলিতে আইস নাই ।" [৫৩] বলিদানের প্রাক্কালে কপাল কুণ্ডলার প্রতিও ই উক্তি পুরুষের শাশ্বত প্রেমিক সত্তার ব্যর্থতার হাহাকার ।

'মৃণালিনী'র নায়ক হেমচন্দ্রকে দিয়ে তার গুরু মাধবাচার্য্য গৌড়রাজ্যে যবন বধের গুরু দায়িত্ব সম্পাদন করতে চেয়েছিলেন । কিন্তু হেমচন্দ্র স্পষ্ট জানায় , "মৃণালিনী কোথায় না বলিলে আমি যবনবধের জন্য অস্ত্র স্পর্শ করিব না ।" [৫৪] মৃণালিনীর জন্য হেমচন্দ্র গুরুকে জানিয়েছে রাজ - শিরা - গর্ব্ব অতলে ডুবিয়ে দিতেও সে প্রস্তুত । মাধবাচার্য্য তাকে মৃণালিনীর মোহমুক্ত করার জন্য মৃণালিনীকে বধ করেছেন এই মিথ্যা সংবাদ প্রদান করলে হেমচন্দ্র সরোষে গুরুকে পর্য্যন্ত হত্যা করতে উদ্যত হয় – ' যে মৃণালিনীর বধকর্ত্তা , সে আমার বধ্য , এই শরে গুরু হত্যা ব্রহ্মহত্যা উভয় দুষ্কৃতমা সাধন করিব ।" [৫৫] এখানে দেখা যায় হেমচন্দ্র নারীরূপ মুগ্ধতা বা প্রণয়িনীর

৫৩। বঙ্কিম রচনাবলী (প্রথম খণ্ড) – সাহিত্য সংসদ ... পৃঃ ১৮৭

৫৪। ঐ ঐ ঐ ... পৃঃ ১৯০

৫৫। ঐ ঐ ঐ ... পৃঃ ১৯০

প্রতি অনুরাগের আধিক্যে গুরু নিন্দা বা কর্তব্যে অবহেলা প্রদর্শনেও পরাঙমুখ নয় ।

পশুপতি এই উপন্যাসের অপর প্রধান পুরুষ চরিত্র । দেবীপদ ভট্টাচার্য্য চরিত্রটি সম্বন্ধে বলেছেন – " পশুপতি চরিত্র চিত্রণ বঙ্কিমচন্দ্রের অবিস্মরণীয় কীর্ত্তি ।" [৫৬] আবার হরপ্রসাদ মিত্র বলেছেন " বঙ্কিম পশুপতিকে সমুচিত সহানুভূতি দিয়েই গড়ে তুলেছেন ।" [৫৭] লেখক এই পঞ্চত্রিংশৎ বৎসরের সুপুরুষ ব্যক্তিকে পান্ডিত্য এবং বিচক্ষণতাগুনে অতুলনীয় বলেছেন । এহেন ব্যক্তিও বিধর্ম্মী যবনকে আমন্ত্রণ করে গৌড়রাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধে তাদের সহায়তা করার প্রতিশ্রুতি দেন । এর আগে আমরা দেখেছি তার এই বিশ্বাসঘাতকতার মূলে রয়েছে তাঁর গভীর দেশপ্রেম ও প্রজাবাৎসল্য । কিন্তু সর্বোপরি রয়েছে মনোরমার প্রতি তাঁর গভীর প্রেম । পশুপতির জীবনের প্রধান সমস্যা ঘনীভূত হয়েছে মনোরমার প্রতি তার আসক্তিকে কেন্দ্র করে । মনোরমা তার পূর্ব্ব পরিণীতা স্ত্রী হলেও দৈব দুর্বিপাকে পশুপতি তার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন এবং তার প্রকৃত পরিচয় অজ্ঞাত । সকলের মতো তিনিও মনোরমাকে বিধবা বলেই জানেন এবং বিধবা বিবাহ করে তাকে নিজ মহিষীর মর্যাদা দেওয়ার সুযোগ লাভের জন্য মুসলমানের সঙ্গে চক্রান্ত করে প্রভু লক্ষ্মণ সেনকে রাজ্যভ্রষ্ট করতে উদ্যোগী হন । তাঁর প্রেমের গভীরতা প্রকাশ পেয়েছে তাঁর এই উক্তিতে " আমি এতবয়স পর্য্যন্ত কেবল বিদ্যা উপার্জ্জন করিয়াছি – বিষয়ালোচনা করিয়াছি , দার পরিগ্রহে অনুরাগ নাই । এজন্য

৫৬। উপন্যাসের কথা – দেবীপদ ভট্টাচার্য ... পৃঃ ১৬২

৫৭। বঙ্কিম সাহিত্য পাঠ – হরপ্রসাদ মিত্র ... পৃঃ ৩ ৬১

আশা করি নাই । কিন্তু যে পর্য্যন্ত তুমি আমার নয়ন পথে আসিয়াছ , সেই পর্য্যন্ত মনোরমালাভ আমার একমাত্র ধ্যান হইয়াছে । সেই লাভের জন্য এই নিদারুণ ব্রতে প্রবৃত্ত হইয়াছি । যদি জগদীশ্বরী অনুগ্রহ করেন , তবে দুই চারি দিনের মধ্যে রাজালাভ করিব এবং তোমাকে বিবাহ করিব । ইহাতে তুমি বিধবা বলিয়া যে বিঘ্ন , শাস্ত্রীয় প্রমাণের দ্বারা আমি তাহার খণ্ডন করিতে পারিব । কিন্তু তাহাতে দ্বিতীয় বিঘ্ন এই যে, তুমি কুলীন কন্যা , জনার্দ্দন শর্ম্মা কুলীন শ্রেষ্ঠ , আমি শ্রোত্রিয় . ..... কিন্তু কুলরীতি ত শাস্ত্রমূলক নহে , কুল নাশে ধর্ম্মনাশ বা জাতিভ্রংশ হয় না । তাঁহার অজ্ঞাতে যদি তোমাকে বিবাহ করিতে পারি , তবে ক্ষতি কি ? তুমি সম্মত হইলেই , তাহা পারি । পরে তোমার পিতামহ জানিতে পারিলে বিবাহ ত ফিরিবে না ।" [৫৮] এই সুদীর্ঘ উদ্ধৃতি পশুপতির প্রেম গভীরতার পরিচায়ক । আরও আশ্চর্য্য লাগে , সেই কৌলীন্য প্রথা প্রবর্তিত সেন বংশের আমলে বিধবার বিবাহ প্রচেষ্টা ও কুলরীতির বিরোধিতা করতে উদ্যোগী হয়েছেনএমন এক ব্যক্তি যিনি সমাজের উচ্চাসনে অধিষ্ঠিত।অন্যায় ব্যভিচারের কলংকিত পথে না গিয়ে পশুপতির এই মনোভাব যথার্থই প্রেমে বলিষ্ঠ পুরুষের চরিত্র প্রকাশক ।

পরে মনোরমার কাছে তার প্রকৃত পরিচয় জানতে পেরে পশুপতির উচ্ছ্বাস আরও বর্দ্ধিত হয় — " জল যাহা হইবার তাহা হইয়া গিয়াছে । এক্ষণে যদি আমি রত্ন পাইয়াছি , তবে আর তাহা গলা হইতে নামাইব না । তুমি আর আমার ঘর ছাড়িয়া যাইতে পারিবেনা ।" [৫৯]

৫৮। বঙ্কিম রচনাবলী — (প্রথম খণ্ড) —সাহিত্য সংসদ .. পৃঃ ২৪০

৫৯। ঐ ঐ ঐ .. পৃঃ ২৪২

মনোরমা তাকে বিশ্বাসঘাতকতার ঘৃণ্য পথ ত্যাগ করে কাশীধামে যাত্রা করার পরামর্শ দিলে পশুপতি যখন বলেন, " আমি যে পথে পদার্পণ করিয়াছি, সে পথ হইতে ফিরিবার উপায় থাকিলে আমি ফিরিতাম — তোমাকে লইয়া সর্ব্বত্যাগী হইয়া কাশীযাত্রা করিতাম। কিন্তু অনেক দূর গিয়াছি, আর ফিরিবার উপায় নাই — যে গ্রন্থি বাঁধিয়াছি তাহা আর খুলিতে পারি না - স্রোতে ভেলা ভাসাইয়া আর ফিরাইতে পারি না। যাহা ঘটিয়াছে তাহা ঘটিয়াছে। তাই বলিয়া কি তোমার পরম সুখে আমি বঞ্চিত হইব ? তুমি আমার স্ত্রী, তোমার কপালে যাই থাকুক, আমি তোমাকে গৃহিণী করিব," [৬০] তখন পশুপতির জীবনের সংকট ও তার আসন্ন বিপর্যয়ের ইঙ্গিত আমাদের ব্যথিত করে। যখন আক্রমনের উন্মত্ত তাণ্ডবে পশুপতির গৃহে অগ্নি সংযোগ হয়, পশুপতি মনোরমার সন্ধানে দাবানলবেষ্টিত গৃহে প্রবেশ করেন, কিন্তু মনোরমার সাক্ষাৎ লাভ আর তাঁর ভাগ্যে ঘটেনি। ইষ্টদেবীর মন্দিরে প্রতিমা সহ পশুপতির জীবন্ত সমাধি হয়। আর এই মর্মান্তিক পরিণতি নীতি শাস্ত্রের মতে হয়ত রাজার প্রতিজার বিশ্বাসঘাতকতার প্রায়শ্চিত্ত, কিন্তু মনোরমার প্রতি তার প্রেমের চরম মূল্যও যে তাকে এভাবে দিতে হোল — তাতে তাঁর প্রতি লেখকের সঙ্গে পাঠকেরও সহানুভূতি না জেগে পারে না।

এই নারীরূপ মুগ্ধতা এবং পুরুষের প্রতি নারীর অত্যাসক্তি পুরুষের জীবনে কী জটিলতা সৃষ্টি করে 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসের প্রতাপ, চন্দ্রশেখর ও মীরকাসেম চরিত্রে তা দেখানো হয়েছে। বেদগ্রামবাসী অধ্যয়ন-প্রিয় ব্রাহ্মণ চন্দ্রশেখর " বত্রিশ বৎসর অতিক্রম করিয়াছিলেন। তিনি গৃহস্থ অথচ সংসারী নহেন। এ পর্যন্ত দার পরিগ্রহ করেন নাই, দার পরিগ্রহে জ্ঞানোপার্জ্জনের বিঘ্ন ঘটে বলিয়া তাহাতে নিতান্ত নিরুৎসাহ

৬০। বঙ্কিম রচনাবলী — (প্রথম খণ্ড) — সাহিত্য সংসদ পৃঃ ২৪২

ছিলেন।" [৬১] এহেন গ্রন্থকীট ব্যক্তির জীবনেও দেখা দিল নারী রূপ মুগ্ধতা, যাকে কেন্দ্র করে তার ভবিষ্যৎ জীবনে বিপর্যয় সূচিত হয়েছে। " শৈবলিনীকে দেখিয়া সংযমীর ব্রত ভঙ্গ হইল। ভাবিয়া, চিন্তিয়া, কিছু ইতস্ততঃ করিয়া অবশেষে চন্দ্রশেখর আপনি ঘটক হইয়া শৈবলিনীকে বিবাহ করিলেন।" [৬২] মাতৃবিয়োগের পর গৃহকার্যে বিশৃঙ্খলার জন্য চন্দ্রশেখর ভেবেছিলেন, বিবাহ করলে সংসারে শৃঙ্খলাবিধান হতে পারে। কিন্তু এই আত্মভোলা, নিষ্ঠাবান, শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ শৈবলিনীর ভাগ্যের সঙ্গে নিজেকে জড়িত করে তার বিবাহিত জীবনে বিপত্তির বীজ বপন করেছিলেন। স্বভাব সংযমী চন্দ্রশেখর শৈবলিনীর রূপে মুগ্ধ হয়ে তাকে বিবাহ করলেন কিন্তু স্ত্রীর প্রতি তার প্রেমাভিব্যক্তি কখনও দেখা গেল না। শৈবলিনী যেন তার গৃহকর্মের সহায়িকা মাত্র। তার অন্তরের অন্তঃস্থলে শৈবলিনীর প্রতি যে গভীর আসক্তি সুপ্ত ছিল সে সম্বন্ধে তিনি নিজেও যেন সচেতন ছিলেন না। তাই তার সান্নিধ্যে এসে বাল্য প্রণয়ী প্রতাপ-বিচ্ছিন্ন শৈবলিনীর প্রেমকাতর হৃদয় তৃপ্ত হতে পারেনি। ফলে সে তার অতৃপ্ত হৃদয়কে নিয়ে দুঃসাহসের পথে সমাজবিধি লঙ্ঘন করে এগিয়েছে। আর এদিকে চন্দ্রশেখর মুর্শিদাবাদ থেকে বেদগ্রামে নিজগৃহে প্রত্যাবর্তন কালে শৈবলিনীর প্রতি তার গোপন আসক্তি সম্বন্ধে সচেতন হয়ে ওঠেন — " গৃহে ফিরিয়া আসিতে দূর হইতে চন্দ্রশেখর নিজগৃহ দেখিতে পাইলেন। দেখিবামাত্র তাঁহার মনে আহ্লাদের সঞ্চার হইল। ..... ঐ গৃহমধ্যে আমার প্রেয়সী ভার্য্যা বাস করেন, এই জন্য আমার এ আহ্লাদ ? .... আমি ভগবদ্বাক্যে অশ্রদ্ধা করিনা,

---

৬১। বঙ্কিম রচনাবলী — (প্রথম খণ্ড) — সাহিত্য সংসদ .. পৃঃ ৪০০

৬২। ঐ ঐ ঐ পৃঃ ৪০১

কিন্তু আমি দারুণ মোহজালে জড়িত হইতেছি । এ মোহজাল কাটিতেও ইচ্ছা করেনা – যদি অনন্ত কাল বাঁচি , তবে অনন্তকাল এই মোহে আচ্ছন্ন থাকিতে বাসনা করিব । কতক্ষণে আবার শৈবলিনীকে দেখিব ? ..... যদি গিয়া শুনি যে , শৈবলিনী উৎকট রোগে প্রাণত্যাগ করিয়াছে ? তাহা হইলে আমি বাঁচিব না ।" [৬৩] সংযমী চন্দ্রশেখরের এই প্রেমের জাগরণ বড় বিলম্বে ঘটেছিল বলেই বড় বেদনাদায়ক । কারণ চন্দ্রশেখর যখন প্রেয়সীর দর্শন কামনায় উন্মুখ তখন দীর্ঘদিনের উপেক্ষা ও অতৃপ্তি শৈবলিনীকে স্বামীগৃহ ত্যাগ করিয়ে বালা প্রণয়ীকে লাভের উদ্দেশ্যে অনিশ্চিত বিপদের ভয়ঙ্কর পথে বের করেছে । চন্দ্রশেখর গৃহে প্রত্যাবর্তন করলেন সর্ব্বনাশ ঘটে যাবার পর । "চন্দ্রশেখর সকল শুনিলেন । তখন , চন্দ্রশেখর সযত্নে গৃহ প্রতিষ্ঠিত শালগ্রাম - শিলা সুন্দরীর পিতৃগৃহে রাখিয়া আসিলেন । তৈজসপত্র প্রভৃতি গার্হস্থ্য দ্রব্যজাত দরিদ্র প্রতিবাসীদিগকে ডাকিয়া বিতরণ করিলেন । সায়াহ্নকাল পর্য্যন্ত এই সকল কার্য্য করিলেন । সায়ং কালে আপনার অধীত , অধ্যয়নীয় , শোণিত তুল্য প্রিয় গ্রন্থ সকল একে একে আনিয়া একত্রিত করিলেন । একে একে প্রাঙ্গনমধ্যে সাজাইলেন – সাজাইতে সাজাইতে এক একবার কোনখানি খুলিলেন – আবার না পড়িয়াই তাহা বাঁধিলেন – সকলগুলি প্রাঙ্গনে রাশীকৃত করিয়া সাজাইলেন । সাজাইয়া তাহাতে অগ্নি প্রদান করিলেন ।" [৬৪] অবশেষে অধ্যয়ন প্রিয়তার উপর চন্দ্রশেখরের নারী প্রেম জয়ী হোল । এবং চন্দ্রশেখরের জীবনে নারীপ্রেমের মূল্যদান মুক্ত হোল । " বহু যত্নে সংগৃহীত বহুকাল হইতে অধীত সেই অমূল্য

৬৩। বঙ্কিম রচনাবলী (প্রথম খণ্ড) – সাহিত্য সংসদ – পৃঃ ৪১১-৪১২
৬৪। ঐ ঐ ঐ পৃঃ ৪১২

গৃহরাশি ভস্মাবশেষ হইয়া গেল। রাত্রি এক প্রহরে গৃহদাহ সমাপন করিয়া উত্তরীয় মাত্র গ্রহণ করিয়া ভদ্রাসন ত্যাগ করিয়া গেলেন, কোথায় গেলেন, কেহ জানিল না — কেহ জিজ্ঞাসা করিল না।" [৬৫]

'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসে সূর্য্যমুখীর গৃহত্যাগের পর তার অনুসন্ধানে নগেন্দ্র গৃহত্যাগ করেছিল। কিন্তু সেই গৃহত্যাগের সঙ্গে চন্দ্রশেখরের এই গৃহত্যাগে পার্থক্য প্রচুর। চন্দ্রশেখরের দীর্ঘকাল সুপ্ত প্রেম যেন হঠাৎ জাগরণে অপরিসীম মূল্য আদায় করে নিল।

এরপর গুরু রমানন্দ স্বামীর সহায়তায় শৈবলিনীর সন্ধান, প্রায়শ্চিত্ত, সাময়িক উন্মত্ততা পরিশেষে তাকে নিয়ে মুঙ্গেরে প্রত্যাবর্তন, নবাবের শিবিরে লরেন্স ফস্টরের স্বীকৃতিতে শৈবলিনীর সতীত্ব প্রমাণ ইত্যাদি সমাপনান্তে চন্দ্রশেখর যখন শৈবলিনীকে পেলেন তখন সেই প্রাপ্তির মধ্যে পরিপূর্ণ আনন্দ কতটা ছিল বলা যায় না। বেদনার কণ্টকাঘাত কি তাদের পীড়িত করেনি?

উপন্যাসের অন্তর্গত ঐতিহাসিক চরিত্র নবাব মীরকাসেমের জীবনের প্রথমিক সমস্যা - ইংরেজের সঙ্গে বিবাদ। তারমধ্যে জটিলতা সৃষ্টি করেছে তার প্রিয় মহিষী দলনী বেগমের প্রেম ও উৎকণ্ঠা। নবাবের প্রেমমুগ্ধা দলনী নবাবের কল্যাণ কামনায় ইংরেজের সঙ্গে নবাবের বিরোধিতার পথ বন্ধ করার জন্য গোপনে গুরগণ খাঁ'র সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে পরোক্ষে তাকে নবাবের বিরুদ্ধে যেতেই সাহায্য করেছে। এরপর ঘটনাচক্রে নবাব-বিচ্ছিন্ন দলনী চরিত্রের অবিশ্বাসিতা সম্বন্ধে মিথ্যা সংবাদ হতভাগ্য নবাবের জীবনে সহজেই বিপর্য্যয় ঘটিয়েছে। কুলসমের কাছে মৃত দলনীর চরিত্র সম্বন্ধে প্রকৃত তথ্য জানার পর বেদনাহত নবাবের প্রতিক্রিয়া — " তখন নবাব রত্ন সিংহাসন ত্যাগ করিয়া উঠিলেন, হীরক - খচিত উষ্ণীষ দূরে নিক্ষেপ

৬৫। বঙ্কিম রচনাবলী — (প্রথম খণ্ড) — সাহিত্য সংসদ প্রকাশিত পৃঃ ৪১২

করিলেন – মুক্তার হার কণ্ঠ হইতে ছিঁড়িয়া ফেলিলেন – রত্নখচিত বেশ অঙ্গ হইতে দূর করিলেন – তখন নবাব ভূমিতে অবলুণ্ঠিত হইয়া " দলনী । দলনী ।" বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন ।" [৬৬] এই মীরকাসেম আর যুবে বাংলা বিহার উড়িষ্যার নবাব নন, চিরন্তন হতভাগ্য প্রেমিক ।

রমণী প্রেমের জন্য চরম মূল্য দিয়েছেন – 'চন্দ্রশেখরে'র প্রতাপ, 'আনন্দমঠে'র ভবানন্দ, 'রাজসিংহে'র মবারক । চন্দ্রশেখরের স্ত্রী শৈবলিনী যাতে দাম্পত্য জীবনে সুখী হতে পারে সেজন্য তার বাল্য প্রণয়ী প্রতাপ নিজের প্রেমকে সযত্নে সংযত রেখেছেন । কিন্তু চন্দ্রশেখরের অধ্যয়নপ্রিয়তা ও শৈবলিনীর প্রেমবুভুক্ষু অতৃপ্ত হৃদয় প্রতাপের অভিলাষ পূর্ণ হতে দেয়নি । প্রতাপকে লাভের আশায় শৈবলিনীর নরেন্দ্র ফষ্টরের সঙ্গে স্বামী গৃহত্যাগের সংবাদ চন্দ্রশেখরের গৃহে ইংরাজের দস্যুতা রূপে জানতে পেরে, কৃতজ্ঞতা ও পরোপকার-বৃত্তিবশে প্রতাপ ফষ্টরের নৌকা আক্রমণ করে শৈবলিনীকে উদ্ধার করেন। এ সময়েও তিনি শৈবলিনীর প্রতি তার সুপ্ত আসক্তির কোন প্রকাশ না করে তাকে 'পাপিষ্ঠা' সম্বোধনে কটূক্তিময় করেন । কিন্তু শৈবলিনীর নির্ভীক ও স্পষ্ট প্রত্যুত্তর তাকে মর্মান্তিক যন্ত্রণা দেয় । শৈবলিনী তাকে অভিযোগ করে " কেন তুমি, তোমার ঐ অতুল্য দেবমূর্ত্তি লইয়া আবার আমায় দেখা দিয়াছিলে ? আমার স্ফুটনোন্মুখ যৌবনকালে, ও রূপের জ্যোতি কেন আমার সম্মুখে তুলিয়াছিলে ? যাহা একবার ভুলিয়াছিলাম, আবার কেন তাহা উদ্দীপ্ত করিয়াছিলে ? আমি কেন তোমাকে দেখিয়াছিলাম ? দেখিয়াছিলাম ত তোমাকে পাইলাম না কেন ? না পাইলাম ত মরিলাম না কেন? তুমি কি জান না, তোমারই রূপ ধ্যান

৬৬। বঙ্কিম রচনাবলী – (প্রথম খণ্ড) – সাহিত্য সংসদ ... পৃঃ ৪৬৪

করিয়া গৃহ আমার অরণ্য হইয়াছিল ? তুমি কি জাননা যে , তোমার সঙ্গে সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইলে যদি কখন তোমায় পাইতে পারি, এই আশায় গৃহত্যাগিনী হইয়াছি ? নহিলে ফষ্টর আমার কে ?

শুনিয়া , প্রতাপের মাথায় বজ্র ভাঙিয়া পড়িল তিনি বৃশ্চিকদংশের ন্যায় পীড়িত হইয়া , সে স্থান হইতে বেগে পলায়ন করিলেন ।" [৬৭]

এই দীর্ঘ বিবৃতি , শৈবলিনীর এই স্পষ্ট স্বীকারোক্তি , প্রতাপকে তার জীবনের বিপর্যয়ের জন্য দায়ী করা এবং প্রতাপের বেগে পলায়ন - এরই মধ্যে উভয়ের ব্যর্থ প্রেমের মর্মান্তিক যন্ত্রণার অভিব্যক্তি ঘটেছে । ঘটনার পরিণতিতে প্রতাপ তার প্রেমাস্পদার সুখের জন্য আত্মবিসর্জনে প্রবৃত্ত হয়েছে । অন্তিম কালে রমানন্দ স্বামীর প্রশ্নের উত্তরে তার এই বলিষ্ঠ প্রেমের যন্ত্রণা জনিত অভিব্যক্তির প্রকাশ " সুপ্ত সিংহ যেন জাগিয়া উঠিল । সেই শবাকার প্রতাপ , বলিষ্ঠ , চঞ্চল , ঊর্দ্ধবৎ হুহুঙ্কার করিয়া উঠিল – বলিল , " কি বুঝিবে , তুমি সন্ন্যাসী । এ জগতে মনুষ্যকে আছে যে আমার এ ভালবাসা বুঝিবে । কে বুঝিবে , আজি এই ষোড়শ বৎসর আমি শৈবলিনীকে কত ভালবাসিয়াছি । পাপচিত্তে আমি তাহার প্রতি অনুরক্ত নহি – আমার ভালবাসার নাম জীবন বিসর্জনের আকাঙ্ক্ষা । শিরে শিরে , শোণিতে শোণিতে , অস্থিতে অস্থিতে , আমার এই অনুরাগ অহোরাত্র বিচরণ করিয়াছে । কখন মানুষে তাহা জানিতে পারে নাই - মানুষে তাহা জানিতে পারিত না – এই মৃত্যুকালে আপনি কথা তুলিলেন কেন ?" [৬৮]

এই মর্মান্তিক উক্তি শৈবলিনীর প্রতি প্রতাপের প্রেমের গভীরতার পরিচয়বাহী ।

৬৭। বঙ্কিম রচনাবলী – (প্রথম খণ্ড) – সাহিত্য সংসদ .. পৃঃ ৪২৪
৬৮। ঐ ঐ ঐ .. পৃঃ ৪৭৫

সে রমানন্দ স্বামীকে তার এই মৃত্যুবরণের কারণ জানায় – " শৈবলিনী বলিয়াছিল যে , এ পৃথিবীতে আমার সঙ্গে তার সাক্ষাৎ না হয় । আমি বুঝিলাম , আমি জীবিত থাকিলে শৈবলিনী বা চন্দ্রশেখরের সুখের সম্ভাবনা নাই । যাহারা আমার পরম প্রীতির পাত্র , যাহারা আমার পরমোপকারী , তাহাদিগের সুখের কণ্টক স্বরূপ এ জীবন আমার রাখা অকর্ত্তব্য বিবেচনা করিলাম । তাই আপনাদিগের নিষেধ সত্ত্বেও এ সমরক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ করিতে আসিয়াছিলাম । আমি থাকিলে , শৈবলিনীর চিত্ত , কখন না কখন বিচলিত হইবার সম্ভাবনা । অতএব আমি চলিলাম ।" [৬৯] শৈবলিনীর প্রেম প্রতাপের জীবনে যে সমস্যা সৃষ্টি করেছিল , প্রতাপ তা চরমতম মূল্যে সমাধানের পথ বেছে নিলেন ।

'আনন্দমঠ' উপন্যাসে সত্যানন্দের প্রধান তরুণ সন্ন্যাসী ভবানন্দের চরিত্রে নারীরূপমুগ্ধতা গুরুতর বিপর্যয় সৃষ্টি করেছে । মহেন্দ্রের স্ত্রী কল্যাণীর জীবন রক্ষা করে ভবানন্দ তার প্রতি অন্যায়ভাবে আসক্ত হয়ে সন্তান ব্রত ভঙ্গ করেন । এই সন্তান ব্রত পালন যে কঠোর ও দুঃসাধ্য ভবানন্দ তা আগেই মহেন্দ্রের কাছে স্বীকার করেন – " সন্তানকে মিথ্যা কথা কহিতে নাই – তোমার কাছে মিথ্যা বড়াই করিব না । মায়া কাটাইতে পারে কে ? যে বলে , আমি মায়া কাটাইয়াছি , হয় তার মায়া কখন ছিল না , বা সে মিছা বড়াই করে । আমরা মায়া কাটাই না – আমরা ব্রত রক্ষা করি ।" [৭০] ভবানন্দের এই উক্তির মধ্যেই তার পদস্খলনের বীজ লুক্কায়িত ছিল । এই সন্ন্যাসীর নিভৃত চিন্তায়ও তাই দেখা যায় কল্যাণীর রূপমুগ্ধতাই প্রভাব বিস্তার করে –"ভবানন্দ তখন

৬৯। বঙ্কিম রচনাবলী – (প্রথম খণ্ড) – সাহিত্য সংসদ ... পৃঃ ৪৭৫
৭০। ঐ ঐ ঐ ... পৃঃ ৭২৭

ঊর্ধ্বদৃষ্টি হইয়া, একখানা মুখ ভাবিতেছিলেন। কাহার মুখ, তাহা জানি না, কিন্তু মুখখানা বড় সুন্দর, কৃষ্ণকুঞ্চিত সুগন্ধি অলকরাশি আকর্ণ প্রসারিত ভ্রূযুগের উপর পড়িয়া আছে। মধ্যে অনিন্দ্য ত্রিকোণ ললাটদেশ মৃত্যুর করাল কাল ছায়ায় গাহমান হইয়াছে। যেন সেখানে মৃত্যু ও মৃত্যুঞ্জয় দ্বন্দ্ব করিতেছে, নয়ন মুদ্রিত, ভ্রূযুগ স্থির, ওষ্ঠ নীল, গণ্ড পাণ্ডুর, নাসা শীতল, বক্ষ উন্নত, বায়ু বসন বিক্ষিপ্ত করিতেছে।" [৭১] এই নিভৃত ভাবনায় নারীরূপ মুগ্ধতা কোন সন্ন্যাসীর উপযোগী নয়। কিন্তু সন্ন্যাসীও যে পুরুষ, নারীরূপ মুগ্ধতা যে তাকে পথভ্রষ্ট করতে পারে লেখক যেন সেই সত্যের প্রতিই ইংগিত করেছেন। ভবানন্দের এই অন্যায় ভাবনার চূড়ান্ত ফলশ্রুতি দেখা যায় কল্যাণীর প্রতি তার স্পষ্ট প্রেম নিবেদনে — " দেখ মনুষ্য হউন, ঋষি হউন, দেবতা হউন, সিদ্ধ হউন, চিত্ত অবশ; সন্তান ধর্ম্ম আমার প্রাণ। কিন্তু আজ প্রথম বলি তুমিই আমার প্রাণাধিক প্রাণ, যেদিন তোমার প্রাণদান করিয়াছিলাম, সেই দিন হইতে আমি তোমার পদমূলে বিক্রীত, আমি জানিতাম না যে, সংসারে এ রূপরাশি আছে। এমন রূপরাশি আমি কখন চক্ষে দেখিব জানিলে, কখন সন্তানধর্ম্ম গ্রহণ করিতাম না। এ ধর্ম্ম এ আগুনে পুড়িয়া ছাই হয়। ধর্ম্ম পুড়িয়া গিয়াছে, প্রাণ আছে। আজি চারি বৎসর প্রাণও পুড়িতেছে, আর থাকে না। দাহ কল্যাণি। দাহ। জ্বালা। কিন্তু জ্বলিবে যে ইন্ধন তাহা আর নাই। প্রাণ যায়। চারি বৎসর সহ্য করিয়াছি। আর পারিলাম না। তুমি আমার হইবে?" [৭২] এই প্রেমোন্মাদনা ভবানন্দকে সন্তান ধর্ম্মে দীক্ষিত সন্ন্যাসীর পরিচয় বিচ্যুত [redacted]

৭১। বঙ্কিম রচনাবলী — (প্রথম খণ্ড) — সাহিত্য সংসদ .. পৃঃ ৭৫৪
৭২। ঐ ঐ ঐ .. পৃঃ ৭৬৪

এক প্রেমিকের পুরুষরূপে পরিচিত করায় । পরস্ত্রীর প্রতি বাল্য প্রণয়ের প্রকাশ ঘটতে না দিয়ে প্রতাপ সাধারণ মানুষ হয়েও যে অসাধারণ চিত্ত সংযমের পরিচয় দিয়েছে , সন্ন্যাসী ভবানন্দের ক্ষেত্রে কিন্তু তা দেখা গেল না । প্রতাপের মৃত্যুবরণ তাকে আদর্শ লোকের উন্নত স্তরে নিয়ে গেছে । আর ভবানন্দের মৃত্যুবরণ তাকে 'ব্রতচ্যুত অধর্মী' পরিচয়েই চিহ্নিত করেছে । প্রতাপের মৃত্যু প্রিয়জনের হিতকামনায় । ভবানন্দের মৃত্যু ব্রতভঙ্গের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ । তবুও যেন ভবানন্দ চরিত্রে এই প্রেমতৃষ্ণা বাস্তবতার উর্ধ্বে অপরিচিত আদর্শলোক থেকে তাকে মর্ত্যমানবের পর্যায়ে পরিচিত করিয়েছে । ব্রতভঙ্গের প্রায়শ্চিত্ত যেভাবে করা দরকার ভবানন্দ সেভাবেই বীরের মত মৃত্যুবরণ করে রমণী রূপমুগ্ধতার অন্যায় আসক্তির প্রায়শ্চিত্ত করেছেন । তবুও তার অকাল মৃত্যু পাঠক হৃদয়ে বেদনার সঞ্চার করে ।

রাজসিংহের জীবনেও সমস্যা এসেছে তার প্রতি চঞ্চল কুমারীর প্রেমানুরাগকে কেন্দ্র করে । অবশ্য চঞ্চলের প্রতি রাণার প্রেম জাগরিত হয়েছে বহুপরে । এখানেও নীতিনিষ্ঠ লেখক এই সংযম শাসিত প্রেমকে মিলনে চরিতার্থ করেছেন ।

কিন্তু নির্মলকুমারীর প্রতি বাদশাহ , আলমগীরের আসক্তি , তাকে ' ইমলি বেগম ' সম্বোধন , অন্তঃপুরে যোধপুরী বেগমের কাছে তাকে থাকবার আদেশ দান — রাজপুত বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধে মোগলবাহিনীর পরাজয়ের পথ প্রশস্ত করেছে । তাই যখন দোর্দণ্ড প্রতাপশালী বাদশাহ একজন সামান্য রাজপুত নারীকে বলেন — " আমি প্রাচীন হইয়াছি , কিন্তু এখন কাহাকেও ভালবাসি নাই । এ জন্মে কেবল তোমাকেই ভালবাসিয়াছি । তাই , তুমি যদি বল যে , তোমার স্বামী না থাকিলে তুমি আমার বেগম হইতে অসম্মত হইলে

এ স্নেহশূন্য হৃদয় - পোড়া পাহাড়ের মত হৃদয় - একটু স্নিগ্ধ হয় ।" ৭৩
তখন এই 'বিশ্বাসের যোগ্য কণ্ঠের সুর' - নবাবের প্রেমশূন্য হৃদয়ের কাতরতা প্রকাশের সঙ্গে তার রাজপুত বাহিনীর কাছে পরাজয়ের মূলে নির্মলকুমারীর ভূমিকার কথাও মনে করিয়ে দেয় ।

প্রতাপ স্বেচ্ছামৃত্যুর পথ বেছে নিয়েছিলেন প্রেমাস্পদার কল্যাণ কামনায় , ভবানন্দ ব্রতভঙ্গের প্রায়শ্চিত্ত হিসাবে মৃত্যুবরণ করেছিলেন , আর মবারকের অদৃষ্টে প্রথম মৃত্যু দণ্ডের কঠোর শাস্তি এসেছিল তার প্রেমিকা বাদশাহজাদী জেবউন্নিসার কাছ থেকে । শাহজাদীর কাছ থেকে প্রেমের এই পুরস্কার মবারকের জীবনে প্রেমের কণ্টকাঘাতের প্রথম প্রাপ্য । জেবউন্নিসার প্রতি আকৃষ্ট মবারক তার পত্নী-দরিয়া বিবির সঙ্গে জীবন যাপন অপেক্ষা নবাব পুত্রীর প্রেমানুগ্রহ লাভের জন্যই উৎসুক ছিলেন বেশী । প্রেম পারস্পরিকতার অপেক্ষা রাখে । কিন্তু নবাবজাদীর অতলস্পর্শী অহংকার এই প্রেমকে উপেক্ষা , অনাদর ও অবহেলায় প্রত্যাখ্যাত করে অবশেষে সর্পদংশনে মবারকের মৃত্যুদণ্ডের বিধান দেয় । মাণিকলালের চেষ্টায় মবারকের পুনর্জীবনলাভ ও কৃতজ্ঞতা স্বরূপ সে ছদ্মবেশে রাজপুত বাহিনীর সহায়তা করে বাদশাহের সেনাবাহিনীর পরাজয়ের পথ প্রস্তুত করে দেয়.। ইতিমধ্যে জেবউন্নিসার অন্তরে দেখা দেয় প্রেমের দহন ও অনুশোচনার যন্ত্রণা । পরিশেষে মবারক স্বীয় ঔদার্যে ও প্রেম মাহাত্ম্যে শাহজাদীর পূর্বকৃত দুর্ব্যবহার বিস্মৃত হয়ে অনুতপ্তা প্রেমিকাকে বিবাহ করেন । এখানেই মবারক নিজের মৃত্যু পথ নিজেই প্রস্তুত করেন । কারণ বাদশাহের অজ্ঞাতে , শাহজাদীর শাহজাদা ভিন্ন অপর পুরুষকে বিবাহ , বিশেষতঃ মোগল বাহিনীর প্রতি মবারকের

৭৩। বঙ্কিম রচনাবলী -- (প্রথম খণ্ড) -- সাহিত্য সংসদ -- পৃঃ ৬৮৫

বিশ্বাসঘাতকতা - এর কোনটাই আলমগীর বাদশাহের কাছে ক্ষমার যোগ্য নয়। সুতরাং নবাব তাকে গোপনে হত্যা করবার চক্রান্ত করেন। আর হতভাগ্য মবারক, নবাব আঘাত হতেও তার প্রেমসমস্যা জর্জরিত জীবনে 'স্ত্রী জাতির প্রেমে অন্ধ' হওয়ার প্রায়শ্চিত্ত সমাধা করেন তার প্রতিহিংসা পরায়ণা পত্নী দরিয়া বিবির বন্দুকের গুলিতে প্রাণ বিসর্জন করে।

অন্ধ রজনীকে কেন্দ্র করে শচীন্দ্র ও অমরনাথের মধ্যে যে প্রেম প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু হয় তাতে শেষ পর্যন্ত শচীন্দ্রের ভাগ্যে প্রেমের বিজয়মালা লাভ, আর অমরনাথ হয় সর্বত্যাগী।

সীতারাম চরিত্র সম্বন্ধে শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, " সীতারাম - চরিত্র বঙ্কিমের অপূর্ব সৃষ্টি, সূক্ষ্ম বিশ্লেষণে ও বাস্তবের সহিত রোমান্সের সংমিশ্রণের সুসংগতিতে ইহা পাশ্চাত্য উপন্যাসের যে কোন সমজাতীয় চরিত্রের সহিত সমকক্ষতার স্পর্ধা করিতে পারে।" ৭৪ এই সীতা - রামের জীবনেও সমস্যা এসেছে নারীরূপ মুগ্ধতাকে কেন্দ্র করে। তার প্রথমা মহিষী শ্রী দৈব দুর্বিপাকে স্বামী পরিত্যক্ত। সে 'প্রিয় প্রাণহন্ত্রী' হবে, দৈবজ্ঞের এই গণনার ফলে তাকে স্বামীগৃহ ত্যাগ করতে হয়, কারণটা অবশ্য শ্রীর কাছে অজ্ঞাত ছিল। এই স্বামী পরিত্যক্ত অসহায় নারী, কাজীর বিচারে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত তার অগ্রজের প্রাণরক্ষার জন্য সীতারামের সাহায্য প্রার্থনা করে। গঙ্গারামের প্রাণরক্ষা কালে শ্রীর সাহসিকতা, বীরত্ব, সৌন্দর্য তার প্রতি সীতারামকে পুনরায় আকৃষ্ট করে। কিন্তু শ্রী তার অদৃষ্টের গণনার

৭৪। বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা — শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় — পৃ: ৯৯

ফল জানতে পেরে স্বেচ্ছায় সন্ন্যাসিনী বেশে দেশত্যাগ করে। এখানেই সীতারামের পতনের সূচনা। কারণ শ্রীর সৌন্দর্য্যে সে তখন মুগ্ধ। অন্যান্য পত্নী অপেক্ষা শ্রীর প্রতি তার আকর্ষণ তখন নূতন বেগে প্রবাহিত।

" শ্রী সীতারামের পক্ষে নূতন। শ্রীর প্রতি সেই উন্মাদকর প্রেম সীতারামের চিত্ত অধিকৃত করিল। অন্তর স্রোতে নন্দা, রমা ভাসিয়া গেল।" [৭৫] দেশত্যাগিনী হওয়ার পর থেকে শ্রীর প্রতি সীতারামের আকুলতা, বিভিন্ন স্থানে তার অনুসন্ধান সীতারামের নূতন আগ্রহের পরিচায়ক। দীর্ঘদিন পরে সন্ন্যাসিনী বেশী শ্রী কে দর্শনের পর তাকে পুনরায় মহিষীরূপে গ্রহণের আর্ত্তি জাগা স্বাভাবিক। কিন্তু স্বামী সহবাসে অনভ্যস্ত সন্ন্যাসিনী বেশ ধারিনী এই 'শ্রী ত সীতারামের শ্রী নয়।' ফলে একদিকে রাজার স্ত্রীরূপ মুগ্ধতা, রাজ্যে তার অমনোযোগ, তিনি রাজ্য ছাড়তে প্রস্তুত তবুও শ্রীকে আর ছাড়তে প্রস্তুত নন — অপরদিকে শ্রী নিজেকে রাজার সম্মুখে রেখেও তার স্বামীত্ব গ্রহণে অস্বীকৃতা। এখানেই প্রজাবৎসল, রাজ্যপালনে সুদক্ষ স্বদেশ প্রেমিক এই পুরুষের জীবনে ধ্বংসের পথ ত্বরান্বিত হয়। এর আগে গঙ্গারামের বিশ্বাসঘাতকতায় ও সীতারামের কনিষ্ঠা পত্নী রমার বুদ্ধিহীনতায় সীতারামের অনুপস্থিতিতে রাজ্য যখন বিধর্মী শত্রুর হস্তগত হবার উপক্রম হয়েছিল তখন সীতারামের আকস্মিক উপস্থিতিতে, তার বুদ্ধি চাতুর্য্যে ও বীরত্বে সংকট মোচন হয়েছিল — কিন্তু এর পরে দেখা গেল সীতারামের উপস্থিতিতেই রাজ্যে নিদারুণ বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয়েছে। কনিষ্ঠা পত্নী রমার মৃত্যুতে রাজার কর্ত্তব্যহীনতা, অনাদর ও অবহেলা আরও প্রকট হয়ে উঠল। শ্রী কে করায়ত্ত করতে না পেরে অবশেষে

৭৫। বঙ্কিম রচনাবলী(প্রথম খণ্ড) — সাহিত্য সংসদ ... পৃ ৮৮৯

ক্রোধোন্মত্ত, হিতাহিত জ্ঞানশূন্য রাজা কুলকামিনীদের সর্ব্বনাশ সাধনেও ইতস্ততঃ করলেন না । সুযোগ বুঝে মুসলমান সৈন্য সীতারামের রাজ্য আক্রমণ করে দখল করল । হৃত সর্ব্বস্ব , সুজন পরিত্যক্ত , আদর্শভ্রষ্ট সীতারামের পূর্ব্বতেজ বিনষ্ট , সুতরাং সহজেই তিনি পরাভূত হলেন ।

সীতারামের এই ভাগ্য বিপর্যয় ও রাজ্য ধ্বংসের মূলে আর একটি পুরুষের রমনীরূপ মুগ্ধতা এবং পরস্ত্রীর প্রতি অন্যায়াসক্তি ক্রিয়াশীল । সেই পুরুষ শ্রীর অগ্রজ এবং সীতারামের অনুগৃহীত নগররক্ষক গঙ্গারাম । সীতারামের কনিষ্ঠা পত্নী রমা , তার স্বভাব সরলতায় গঙ্গারামকে হিতৈষী জ্ঞানে বিশ্বাস করেছিল , কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে দেখা গেল এই অল্পবুদ্ধি নারী প্রভুভক্ত গঙ্গারাম চরিত্রেনীচতা প্রবেশের পথ সৃষ্টিতে সহায়তা করেছে । যে গঙ্গারাম সীতারামের অনুপস্থিতিতে মুসলমানের রাজ্য আক্রমন ভয়ে ভীতা নির্বোধ রমার মুসলমানদের রাজ্য ছেড়ে দেওয়ার প্রস্তাবের বিরোধিতা করে বলে , " আমি প্রাণে মরিলেও এ কাজ আমা হইতে হইবে না । যদি এমন কাজ আরম্ভ করে , আমি স্বহস্তে তাহার মাথা কাটিয়া ফেলিব ।" [৭৬] সেই গঙ্গারাম রমার সৌন্দর্য্যে অন্যায় আসক্তির ফলে সীতারাম ও রমার সর্ব্বনাশ সাধনের জন্য তোরাব খাঁর সঙ্গে গোপনে সাক্ষাৎ করে মহম্মদপুরে মুসলমান অধিকার সহায়তা করার জঘন্য বিশ্বাসঘাতকতায় প্রবৃত্ত হয় । সে সঙ্কল্প করে " পৃথিবীতে যত পাপ থাকে , সব আমি করিব , তবু রমাকে ছাড়িব না ।" [৭৭] সীতারামের প্রতি কৃতজ্ঞ গঙ্গারাম এতদিন নগররক্ষকের কাজ দক্ষতার সঙ্গে পালন করছিল । কিন্তু এই নারীরূপমুগ্ধতা তার মধ্যে কৃতঘ্নতার সূচনা ঘটায় । এরই পরবর্ত্তীকালে গঙ্গারামের

৭৬। বঙ্কিম রচনাবলী (প্রথম খণ্ড) — সাহিত্য সংসদ .. পৃঃ ৯০২

৭৭। ঐ ঐ ঐ .. পৃঃ ৯০৬

অসদভিসন্ধির জন্য সীতারাম কর্তৃক তার কারাদণ্ড ও অবশেষে জয়ন্তীর কৃপায় মুক্তিলাভ ঘটলেও রাজ্যত্যাগ করতে হয় - অবশেষে গোলন্দাজ মুসলমান সেনার ছদ্মবেশে সীতারামের হাতে তার মৃত্যু । তাই পরস্ত্রীর প্রতি গঙ্গারামের অন্যায় আসক্তি সম্বন্ধে ঔপন্যাসিক যথার্থই বলেছেন — " একে ভালবাসা বলে না ..... এ একটা সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট চিত্তবৃত্তি — যাহার হৃদয়ে প্রবেশ করে, তাহার সর্ব্বনাশ করিয়া ছাড়ে ।" [৭৮]

এই নারীরূপ মুগ্ধতা পুরুষের জীবনে কতটা সর্ব্বনাশের কারণ তার পরিচয় পাওয়া যায় 'বিষবৃক্ষের' নগেন্দ্র এবং 'কৃষ্ণকান্তের উইল' এর গোবিন্দলালের চরিত্রে । বিশেষতঃ বিবাহিত পুরুষের জীবনে অন্যাসক্তি তার সংসার ও জীবনের মর্মান্তিক অশান্তির কারণ হিসাবেই নির্দেশিত হয়েছে ।

সূর্যমুখীর রূপে, গুণে, প্রেমে পরম পরিতৃপ্ত নগেন্দ্রনাথের জীবনে সর্ব্বনাশের শনির প্রবেশ কুন্দনন্দিনীর সঙ্গে । উল্লেখ্য এই যে, কুন্দ এক্ষেত্রে কোন সক্রিয় ভূমিকা গ্রহন করেনি, নগেন্দ্র - সূর্যমুখীর সুখের সংসারে, অশান্তি সৃষ্টি করতেও সে কুণ্ঠিত । তবুও ঘটনা বিপাকে সে সূর্যমুখীর সপত্নী, এবং তার গৃহত্যাগের কারন হয়েছে । সে নগেন্দ্র - সূর্যমুখীর আনন্দপূর্ণ সংসারকে সম্পূর্ণ বিপর্য্যস্ত করেছে । অথচ সে তার প্রেমকে প্রকাশে কুণ্ঠিত ছিল এবং অনিচ্ছা সত্ত্বেও কমলমণির কথায় তার সঙ্গে নগেন্দ্রর সংসার ছেড়ে যেতেও প্রস্তুত হয়েছিল । "কুন্দনন্দিনী' পরের মঙ্গল মন্দিরে আপনার প্রণের প্রাণ বলি দিল । নগেন্দ্রের মঙ্গলার্থ, সূর্যমুখীর মঙ্গলার্থ, নগেন্দ্রকে ভুলিতে স্বীকৃত

৭৮। বঙ্কিম রচনাবলী (প্রথম খণ্ড) — সাহিত্য সংসদ পৃঃ ১০৪

হইল –" [৭৯] ঔপন্যাসিকের এই উক্তিতেই প্রমাণিত হয় যে কুন্দ নগেন্দ্র ও সূর্যমুখীর জীবনে অশান্তি সৃষ্টির পথ বন্ধ করতেও চেষ্টা করেছিল। কিন্তু কুন্দের এই প্রয়াস ব্যর্থ হয়েছে তার প্রতি নগেন্দ্রর অত্যাসক্তির ফলে। নারীরূপমুগ্ধতায় হিতাহিত বোধশূন্য নগেন্দ্র তাকে বলেছেন " তোমাকে ছাড়িয়া দিতে পারি না। শুন, কুন্দ। এখন বিধবা বিবাহ চলিত হইতেছে – আমি তোমাকে বিবাহ করিব।" [৮০] অবশেষে নগেন্দ্রর সঙ্গে কুন্দর বিবাহ দিয়েছে সূর্যমুখী। কিন্তু বিবাহের পর সূর্যমুখীর গৃহত্যাগ নগেন্দ্রর জীবনে জটিলতা আরও ঘনীভূত হয়েছে - কুন্দের প্রতি তার মোহভঙ্গ সুরু হয়েছে। এ পর্যন্ত নগেন্দ্র রূপত মোহের দুর্নিবার স্রোতে ভাসমান অসহায় পুরুষ। কিন্তু সূর্যমুখীর গৃহত্যাগের পরই যেন তিনি আত্মসচেতন ও সক্রিয় হয়ে উঠেছেন। পূর্ব সুখ স্মৃতি তার মধ্যে অনুতাপের বৃশ্চিক দংশন জ্বালা সৃষ্টি করেছে। " কুন্দনন্দিনীকে লইয়া আর গৃহে থাকিতে পারি না। সে চক্ষুঃশূল হইয়াছে। তাহার দোষ নাই - দোষ আমারই কিন্তু আমি তাহার মুখদর্শন আর সহ্য করিতে পারিনা"– [৮১] হরদেব ঘোষালের কাছে লেখাপত্রে নগেন্দ্রর এই উক্তি তার জীবনের চরম বেদনার পরিচয়বাহী। যে নগেন্দ্র কিছুদিন আগে বলেছিলেন কুন্দকে ছেড়ে তিনি থাকতে পারবেন না এখন তারই কাছে কুন্দনন্দিনীর মুখদর্শন অসহ্য। এখন গৃহত্যাগিনী সূর্যমুখী তার কাছে পরম প্রার্থনীয়, সেই পতিপরায়ণা পূর্ব পত্নীর জন্য তার অপরিসীম ব্যাকুলতা। অবশেষে তারই সন্ধানে তিনিও গৃহত্যাগ করলেন। কুন্দ হলো উপেক্ষিতা। সূর্যমুখীর প্রত্যাবর্তনের

৭৯। বঙ্কিম রচনাবলী (প্রথম খণ্ড) – সাহিত্য সংসদ ... পৃঃ ২৮৪

৮০। ঐ ঐ ঐ ... পৃঃ ২৮৮

৮১। ঐ ঐ ঐ ... পৃঃ ৩১৪

পরও কিন্তু নগেন্দ্রের জীবনে পূর্ণ সুখের সম্ভাবনা দেখা দিল না । উপেক্ষিতা, অসহায়া কুন্দ বিষপানে আত্মহত্যা করল । নগেন্দ্রর রূপতৃষ্ণাই এভাবে একদিকে তার নিজের জীবনকে সুখের সান্নিধ্য থেকে বিচ্যুত করল — অপরদিকে কুন্দের অকাল মৃত্যু ঘটাল ।

নারীরূপ মুগ্ধতা এই উপন্যাসের অপর প্রধান চরিত্র দেবেন্দ্র নাথের জীবনকেও ধ্বংসের পথে টেনে নিয়ে গিয়েছিল । তার পত্নী কুরূপা ও মুখরা । সুতরাং তার দাম্পত্য জীবন মরুতুল্য । কুন্দের রূপরাশি দেবেন্দ্রের অতৃপ্ত ইন্দ্রিয় লালসায় ইন্ধন যুগিয়ে তার পতনের পথ প্রশস্ত করল । এরই সঙ্গে যুক্ত হোল দেবেন্দ্রের প্রতি হীরার আকর্ষণ ও প্রত্যাখ্যানের চরম প্রতিহিংসা । পরিণামে হীরা উন্মাদিনী এবং দেবেন্দ্রও কদর্য্য রোগগ্রস্ত অবস্থায় অকাল মৃত্যু বরণ করে ।

রমণী রূপমুগ্ধতা গোবিন্দলালের জীবনকে সর্ব্বাধিক বেদনাদায়ক পরিণতির সম্মুখীন করেছে । রূপে , গুণে , পত্নী প্রেমে , আদর্শ বাদিতায় তিনি নগেন্দ্রের সমতুল্য । তার জীবনের সমস্যা নগেন্দ্রের থেকেও ভয়াবহ । তিনি সুপুরুষ । কিন্তু স্ত্রী 'কালো ভ্রমরের' প্রতি তার কোন বিরাগ ছিল না । তবুও রোহিনী সম্পর্কে তার মনে কোন পাপভাবনা বা আসক্তি দেখা দেবার পূর্ব্বেই তিনি মিথ্যা অপবাদে কলংকিত । তদুপরি তার প্রতি ভ্রমরের অবিশ্বাস ও অভিমানে পিতৃগৃহে গমন গোবিন্দলাল-রোহিনী সম্পর্কিত সমস্যায় আরও ইন্ধন জুগিয়েছে । ফলে যে গোবিন্দলাল-রোহিনী সম্পর্কিত পাপভাবনা ভুলবার জন্য জমিদারী মহাল দেখতে বন্দরখালি গিয়েছিলেন সেই গোবিন্দলাল ভ্রমরের অভিমান ও অবিশ্বাসের শাস্তি স্বরূপ অবশেষে হরিদ্রাগ্রামে ফিরে রোহিনীর অলৌকিক রূপ ধ্যান করেই সময় কাটাতে লাগলেন । এভাবে সুখী দম্পতির পরস্পরিক ভুল বোঝাবুঝি আদর্শ পুরুষ গোবিন্দলালকে অধঃপতনের

পথে নিয়ে গেছে । এরই মধ্যে জমিদার কৃষ্ণকান্ত রায় গোবিন্দলাল সম্পর্কে সন্দেহযুক্ত হয়েই হয়ত পুনরায় উইল পরিবর্তনে মৃত্যুকালে গোবিন্দলালকে সম্পত্তির অধিকার থেকে বঞ্চিত করে ভ্রমরকে তার সম্পত্তির পূর্ণ অধিকারিণী করেন । এখানেও গোবিন্দলালের জীবনে দুর্ভাগ্যের এক্যিক বিস্তার , অধঃপতনের পিচ্ছিল পথে অবতরণের সুযোগ এনে দেয় । ভ্রমর তার সমুদয় সম্পত্তি স্বামীর নামে লিখে দিতে চাইলেও অভিমান ক্ষুব্ধ জমিদার তনয় পত্নীর বিষয় ভোগে বা দান গ্রহণে স্বীকৃত হলেন না , বরং স্বোপার্জনের পথ অনুসন্ধানের নাম করে দেশত্যাগের একটা কারণ খুঁজে পেলেন ।

"গোবিন্দলাল তখন ভাবিতেছিল ," এ কালো । রোহিনী কত সুন্দরী , এর গুণ আছে , তার রূপ আছে । এতকাল গুনের সেবা করিয়াছি , এখন কিছুদিন রূপের সেবা করিব — আমার এ আমার , এ আশাশূন্য , প্রয়োজন শূন্য জীবন ইচ্ছামত কাটাইব , মাটির ভান্ড যেদিন ইচ্ছা সেইদিন ভাঙিয়া ফেলিব ।" [৮২] নারীরূপ তৃষ্ণা যে গোবিন্দলালকে সর্বনাশের পথে নিয়ে চলেছে এবং গোবিন্দলালও যে সে বিষয়ে সচেতন তা - এই উক্তির মধ্যেই নিহিত । নগেন্দ্রর জীবনে দুঃখ প্রবল হয়েছিল কুন্দকে বিয়ের পর সূর্যমুখীর স্বামী গৃহত্যাগে । কিন্তু গোবিন্দলাল ভ্রমরকে পরিত্যাগ করতে উদ্যোগী হয়েই নিজের জীবনকে ' প্রয়োজনশূন্য , আশাশূন্য ' — বলে ভাবতে সুরু করেছেন । যে গোবিন্দলাল এর আগে " মনে মনে শপথ করিয়া স্থির করিলেন , মরিতে হয় মরিব , কিন্তু তথাপি ভ্রমরের কাছে অবিশ্বাসী বা কৃতঘ্ন হইব না ।" [৮৩] সেই গোবিন্দলাল এখন রোহিনীর রূপতৃষ্ণায়

৮২। বঙ্কিম রচনাবলী (প্রথম খন্ড) — সাহিত্য সংসদ ... ৫৭৮

৮৩। ঐ ঐ ঐ ... ৫৪৭

পূর্ব পথ বিস্মৃত। রোহিনীর প্রতি রূপমোহজাত আসক্তি তার চরিত্রবল ও সংযম শক্তিকে বিনষ্ট করেছে। 'কালো ভ্রমরে'র প্রেমমুগ্ধ গোবিন্দলাল ও হয়ত কখনও ভাবেননি তার মধ্যে এভাবে রূপতৃষ্ণা জাগ্রত হয়ে ভ্রমরের প্রতি নিদারুণ অবিচারে তাকে প্রবৃত্ত করবে। কিন্তু রোহিনীকে দেখবার পর ধীরে ধীরে সেই রূপ তৃষ্ণাই প্রবল হয়ে উঠল – " তাহার এই পূর্ণ যৌবন, মনোবৃত্তি সকল উদ্বেলিত, সাগর তরঙ্গতুল্য প্রবল রূপতৃষ্ণা অত্যন্ত জাগ্রত। ভ্রমর হইতে সে তৃষ্ণা নিবারিত হয় নাই, নিদাঘের নীল মেঘমালার মত রোহিনীর রূপ, এই চাতকের লোচন পথে উদিত হইল – প্রথম বর্ষার মেঘদর্শনে চঞ্চলা ময়ূরীর মত গোবিন্দলালের মন রোহিনীর রূপ দেখিয়া নাচিয়া উঠিল।" [৮৪] এই রূপতৃষ্ণাই ভ্রমর গোবিন্দলালের সুখী – শান্তিপূর্ণ জীবনকে অশান্তির দাবদাহে বিনষ্ট করেছে।

রোহিনী গোবিন্দলালের কল্যাণার্থে, কোন পূর্ব অভিপ্রায় মনে না রেখে, সেচ্ছায় উইল পরিবর্তন করতে গিয়েছিল কিন্তু ঘটনাচক্রে তারই জন্য গোবিন্দলাল সমস্ত সম্পত্তির অধিকার লাভে বঞ্চিত হয়ে কলঙ্কের পথে দেশত্যাগী হয়েছিলেন। প্রসাদপুরে রোহিনীর সঙ্গে তার জীবনযাত্রা সেই কলঙ্কিত জীবনাচরণের পরিচয় বাহী। নগেন্দ্রের মত স্বীয় সংসারে পুনঃ প্রত্যাবর্তনের সুযোগ আর গোবিন্দলালের জীবনে ঘটেনি। রোহিনীর বিশ্বাসহীনতায়, ভ্রমরের স্মৃতিপীড়িত গোবিন্দলাল পিস্তলের গুলিতে রোহিনীর বিশ্বাসভঙ্গের শাস্তি দান করে ফেরারী আসামীর যন্ত্রণাদায়ক জীবন যাপনে বাধ্য হন। অবশেষে কারাবাসের পর তার হরিদ্রাগ্রামে প্রত্যাবর্তন নিঃসঙ্গ পুরুষ হিসাবে। ভ্রমরকে নিয়ে সুখী জীবনের সুযোগ আর তার হয়না ভ্রমরের বেদনাদায়ক অকাল মৃত্যুতে।

৮৪। বঙ্কিম রচনাবলী (প্রথম খণ্ড) – সাহিত্য সংসদ ... পৃ ৫৬৭

ঔপন্যাসিক তার এই সর্ব্বরিক্ত জীবনকে সন্ন্যাসের পথে প্রবর্তিত করে শান্তির প্রলেপ দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। যার ফলে গোবিন্দলাল ভগবৎ পাদপদ্মে মন স্থাপন করে তাঁকে ভ্রমরাধিক ভ্রমর জ্ঞানে শান্তি লাভের চেষ্টা করেছেন।

গোবিন্দলালের জীবনের বেদনা ও সমস্যার গভীরতা সম্পর্কে প্রমথনাথ বিশী বলেছেন — " দুঃখের মহিমায় এবং দুঃখ জাত শান্তির গভীরতর মহিমায় সম্পন্ন গোবিন্দলাল পূর্বতন ধনঞ্জয় নগেন্দ্রনাথকে অনেকদূর ছাড়িয়ে গিয়েছে। নগেন্দ্রনাথ শিষ্ট ভদ্রলোকের সাময়িক ভ্রান্তির উদাহরণ, আর গোবিন্দলাল দুর্দমণীয় মানব স্বভাবের চিরন্তন ট্রাজেডি .... নগেন্দ্রনাথের সৃষ্টা মানুষ আর নিয়তির হাতে গোবিন্দলালের সৃষ্টি।" [৮৫] সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর বক্তব্যে যেন এই অভিমতকেই আরও স্পষ্ট করে তুলেছেন — " বঙ্কিমের কোন নায়ক গোবিন্দলালের মত স্পষ্ট নয়। মানুষের জীবন যে সব সময়েই ছক অনুবর্ত্তী নয় গোবিন্দলাল তার বড় প্রমাণ। .... ঘটনার বিন্যাসে ও শেষ পর্য্যন্ত পুষ্পোদ্যানের অভিমুখী প্রচেষ্টায় গোবিন্দলাল দস্তয়েভস্কির নায়কদের স্মৃতিবহ।" [৮৬]

বঙ্কিম পরবর্ত্তীকালে রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'চোখের বালি' উপন্যাসের সূচনাতে বলেছেন — " সাহিত্যের নবপর্যায়ের পথটি হচ্ছে ঘটনা পরম্পরার বিবরণ দেওয়া নয়। বিশ্লেষণ করে তাদের আঁতের কথা বের করে দেখানো।" ৮৭ বঙ্কিমের ঘটনা প্রধান উপন্যাসে, বাংলা উপন্যাসের সেই প্রথম পর্যায়ে, নরনারীর 'আঁতের কথা' বিশ্লেষণ করে দেখানো সম্ভব না

৮৫। বঙ্কিম সরণী — প্রমথনাথ বিশী ... পৃঃ ২০১
৮৬। বাংলা উপন্যাসের কালান্তর — সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় .. পৃঃ ১৩৭
৮৭। রবীন্দ্র রচনাবলী — (অষ্টম খণ্ড) জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ. পৃঃ ২১২

হলেও বঙ্কিম তাঁর উপন্যাসের চরিত্রে অনেকক্ষেত্রেই গভীর অন্তর্দ্বন্দ্বের প্রকাশ ঘটিয়ে আধুনিকতার আভাস দিয়েছেন। অচ্যুত গোস্বামী এ সম্পর্কে বলেছেন — " বঙ্কিমের সময়ে চরিত্রের সূক্ষ্ম মনস্তাত্ত্বিক রূপায়ণ আশা করা যায় না। তখনো ফ্রয়েড দেখা দেননি। ..... তবু বঙ্কিমের শৈল্পিক অন্তর্দৃষ্টি ফ্রয়েডের মনোলোকের ইমারতের যে মূল ভিত্তি, জৈবিক প্রবৃত্তির মর্মে সমাজ কর্তৃক চাপিয়ে দেওয়া নৈতিকতার অন্তর্দ্বন্দ্ব — তাকে অনুধাবন করতে পেরেছিল। সেই জন্যই বঙ্কিম সাহিত্যের দ্বন্দ্ব শুধু বহির্জগতেই নয়, মানুষের অন্তর্লোকেও প্রসারিত। এই অন্তর্দ্বন্দ্ব যে কত যন্ত্রণাদায়ক গোবিন্দলাল ও নগেন্দ্রের চরিত্রে লেখক তাকে পূর্ণ সহানুভূতির সঙ্গে উপস্থিত করেছেন।" [৮৮]

'বিষবৃক্ষের' নায়ক নগেন্দ্রনাথ, সূর্যমুখীর প্রতি অনুরক্ত ও বিশ্বস্ত, সংসার জীবনে সুখী হয়েও বিধবা কুন্দনন্দিনীর রূপে আকৃষ্ট হলেন। পুরুষের জীবনে এই বিপুর প্রবল্য ও পীড়ন বড় বেদনা দায়ক। নগেন্দ্রনাথও যে এই অন্যায় আসক্তির জন্য গভীর অন্তর্বেদনায় পীড়িত হয়েছেন মনদিনী কমলমণিকে লিখিত সূর্যমুখীর পত্রে তার পরিচয় রয়েছে — " আমি প্রত্যহ দেখিতে পাই, তিনি প্রতিপদে আপনার চিত্তকে বশ করিতেছেন। ..... কুন্দনন্দিনীর জন্য তিনি আপনার নিকট আপনি অপরাধী হইয়াছেন। এজন্য কখন কখন আমার প্রতি অকারণ ভর্ৎসনা করেন। সে রাগ আমার উপর নহে — আপনার উপর।" [৮৯] একদিকে নগেন্দ্রনাথের নারীরূপ মুগ্ধতা অপরদিকে সাধ্বী স্ত্রী সূর্যমুখীর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা, উভয়ের সংঘাতে নগেন্দ্রনাথ নিজে যে কতটা

৮৮। বাংলা উপন্যাসের ধারা — অচ্যুত গোস্বামী — ... পৃঃ ৬৭

৮৯। বঙ্কিম রচনাবলী (প্রথম খণ্ড) — সাহিত্য সংসদ .. পৃঃ ২৭৮

বিধৃত হচ্ছেন কুন্দের কাছে তিনি তার প্রকাশ ঘটিয়েছেন — " কি কষ্টে যে বাঁচিয়া আছি , তাহা বলিতে পারিনা । আপনার সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া আপনি যত বিক্ষত হইয়াছি । ইতর হইয়াছি , মদ খাই । আর পারি না ।" ১০ দুর্দমনীয় চিত্তবৃত্তি যে আদর্শ গুণযুক্ত পুরুষের জীবনেও কতটা শোচনীয় দুরবস্থার সৃষ্টি করে বঙ্কিম তাঁর এই পুরুষ চরিত্রের মধ্যে তারই পরিচয় দিয়েছেন ।

গোবিন্দলালের যন্ত্রণা আরও মর্মান্তিক - রোহিনীর প্রতি তার আসক্তি , তার ব্যক্তি জীবনের সমস্যা এরই সঙ্গে সংঘাত বেধেছে জমিদার কৃষ্ণকান্ত রায়ের ভ্রাতুষ্পুত্রের সামাজিক মর্যাদার , ব্যক্তিসত্তা ও সামাজিক সত্তার তীব্র দ্বন্দ্ব যে দাহ সৃষ্টি করেছে তারই ফলে তার সুখের জীবন হয়েছে ভস্মীভূত , ছন্নছাড়া । নগেন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে তার স্ত্রী সূর্যমুখী নিজেই উদ্যোগী হয়ে বিধবা কুন্দের সঙ্গে স্বামীর বিবাহ দিয়েছিল । সেক্ষেত্রে নগেন্দ্রনাথের বিবেকের দংশন গোবিন্দলালের মত তীব্র নয় । ভ্রমরের ব্যক্তিত্ব সূর্যমুখীর মত শুধু অভিমানেই তাকে আবদ্ধ করেনি । সে গোবিন্দলালকে লিখেছিল , " যতদিন তুমি ভক্তির যোগ্য , ততদিন আমারও ভক্তি ; যতদিন তুমি বিশ্বাসী ততদিন আমারও বিশ্বাস , এখন তোমার উপর আমার ভক্তি নাই । তোমার দর্শনে আমার আর সুখ নাই । তুমি যখন বাড়ী আসিবে , আমাকে অনুগ্রহ করিয়া খবর লিখিও — আমি বাঁদিয়া কাঁটিয়া যেমন করিয়া পারি , পিত্রালয়ে যাইব ।" ১১ গোবিন্দলালের আগমন সংবাদে ভ্রমর সত্যই পিত্রালয়ে গিয়েছিল । তার এই ব্যক্তিত্ব আধুনিক নারীর ব্যক্তিত্বের উপযোগী । এই

১০। বঙ্কিম রচনাবলী (প্রথম খণ্ড) — সাহিত্য সংসদ ... পৃঃ ২৮৮

১১। ঐ ঐ ঐ ... পৃঃ ৩৭২

ব্যক্তিস্বত্বের অধিকারিণী যে স্বামীকে পুনর্ব্বিবাহ দিয়ে সপত্নী ভোগে উদ্যোগী হবে না তা বলাই বাহুল্য। বিশেষতঃ বিধবার প্রতি স্বামীর আসক্তি তার সামাজিক সংস্কারে অমার্জনীয় অপরাধ। গোবিন্দলাল এই রমণী রত্ন নিয়ে পরম পরিতৃপ্ত ছিলেন। রোহিনী সেখানে যে অশান্তির ঘূর্ণিঝড় সৃষ্টি করেছে তার হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য গোবিন্দ লালের প্রাথমিক প্রয়াস বড় বেদনাদায়ক। তার প্রতি রোহিনীর আসক্তির বিষয় জানতে পেরে " তখন গোবিন্দলাল সেই বিজন কক্ষ মধ্যে সহসা ভূপতিত হইয়া ধূল্যবলুণ্ঠিত হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। মাটিতে মুখ লুকাইয়া দরবিগলিত লোচনে ডাকিতে লাগিলেন " হা নাথ! নাথ। তুমি আমায় এ বিপদে রক্ষা কর। তুমি বল না দিলে, কাহার বলে আমি এ বিপদ হইতে উদ্ধার পাইব? — আমি মরিব — ভ্রমর মরিবে। তুমি এই চিত্তে বিরাজ করিও — আমি তোমার বলে আত্মজয় করিব।" [১২] কিন্তু কাহিনীর অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেছে গোবিন্দ লালের এই আত্মজয় প্রয়াস কার্যকরী হয়নি। দুর্দমনীয় চিত্তবৃত্তির কাছে নিয়তিতাড়িত ব্যক্তির আত্ম সংযম প্রয়াস যে কত অকিঞ্চিৎকর গোবিন্দলালের ক্ষেত্রে লেখক তাই দেখিয়েছেন। আবার রোহিনী রূপের প্রতি নিজের আকর্ষণ সম্বন্ধে সচেতন হয়ে যে গোবিন্দলাল " মনে মনে শপথ করিয়া, স্থির করিলেন, মরিতে হয় মরিব, কিন্তু তথাপি ভ্রমরের কাছে অবিশ্বাসী বা কৃতঘ্ন হইব না।" [১৩] সে-ই পরিশেষে ভ্রমরের প্রতি নির্মম কৃতঘ্নতার পরিচয় দিয়েছেন। কিন্তু ভ্রমর অন্তরে, রোহিনী বাহিরে উভয়ের সংঘাতে নিজে হয়েছেন জর্জরিত।

বঙ্কিমের উপন্যাসের এই দ্বন্দ্বমথিত পুরুষ চরিত্রগুলি

১২। বঙ্কিম রচনাবলী (প্রথম খণ্ড) — সাহিত্য সংসদ ... পৃ: ৩৬৬

১৩। ঐ ঐ ঐ ... পৃ: ৩৬৭

তাদের অতুল গুণরাশির মধ্যেও ভ্রান্তি ও পদস্খলনের ফলে রক্ত মাংসের বাস্তব মানুষের মতই দুর্বলতার বশীভূত হয়েছে । এদের অন্তর্দ্বন্দ্বের পীড়নে আমরা পরিচিত ব্যক্তিসত্তার চেহারা যেন খুঁজে পাই । তাই নগেন্দ্রনাথ বা গোবিন্দলাল আমাদের কাছে অপরিচিত বা অবাস্তব মনে হয় না । সমাজ বিগর্হিত কামনার বশীভূত হয়েও তারা ঔপন্যাসিকের উপস্থাপন কৌশলে পাঠকের সহানুভূতি ও ভালবাসা থেকে বিচ্যুত নয় । চরিত্র সৃজনে এই কৃতিত্ব বঙ্কিমচন্দ্রকে আধুনিকতার দিকে অগ্রণী করেছে বলা যায় । অচ্যুত গোস্বামীর মন্তব্য এখানে উদ্ধৃত করা যেতে পারে – " তার পূর্বতন বা সমকালীন সাহিত্যে সমাজ বিগর্হিত কামনার (একে কেউ প্রেম বলে স্বীকার করেনি) যারা বশীভূত হয়েছে তারা নরকের জীব । বঙ্কিম কিন্তু সেভাবে সমস্যার উপস্থিত করেন নি । তার রোহিনী বা গোবিন্দলাল বা নগেন্দ্র নানা দিক দিয়ে খুব আকর্ষণীয় চরিত্র । তবু যে তারা প্রেমের জালে জড়িয়ে পড়ল তার পিছনের মানসিক ইতিহাসও বঙ্কিম অত্যন্ত দরদ এবং বাস্তবতার সঙ্গে উপস্থিত করেছেন । সমস্যার এ রকমের মানবীয় এবং বাস্তবানুগ উপস্থাপন বঙ্কিমের যুগে প্রায় দুর্লভ ব্যাপার । তার নজির বাংলা সাহিত্যে এক আধটির বেশি তো ছিলই না ,এমন কি সমকালীন ইংরেজী সাহিত্যেও ঠিক এই ধরণের কোন নজির ছিল কিনা সন্দেহের বিষয় । " [১৪]

প্রাক্ বঙ্কিম যুগের রচনাগুলিতে যে চরিত্রগুলির সঙ্গে আমরা পরিচিত হয়েছি সেখানে চরিত্রের এই অন্তর্দ্বন্দ্ব সম্পূর্ণই অলক্ষিত বলা যায় । সেখানকার চরিত্রগুলি মতিলাল ও রামলাল অর্থাৎ কেবলমাত্র ভালো ও মন্দ এই উভয় বৈশিষ্ট্যের অধিকারী রূপে উপস্থাপিত হয়েছে । কিন্তু ভালো মন্দ বিশ্লিষ্ট

১৪। বাংলা উপন্যাসের ধারা – অচ্যুত গোস্বামী .... পৃঃ ৬৭

মানবীয় চরিত্রের কামনা - বাসনা ও যন্ত্রনাকে সহৃদয়তার সঙ্গে চিত্রিত করে ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র আধুনিক চরিত্র সৃষ্টির পথে স্বীয় কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখে গেছেন। মানুষ যে তার পশুবৃত্তি পরিত্যাগ করে মানবত্বের পথে এগিয়ে চলেছে কিন্তু দেবত্ব তার অভিলষিত নয় সেটাই যেন বঙ্কিমের চরিত্রগুলির মূল বক্তব্য।

সামাজিক উপন্যাসের পুরুষ চরিত্রগুলির মধ্যেই যে কেবল এই অন্তর্বেদনার পরিচয় দেখিয়েছেন তা নয় ইতিহাসাশ্রিত উপন্যাসের অন্তর্গত চরিত্রেতেও আমরা এই অন্তর্দ্বন্দ্বের পীড়ন দেখতে পাই। 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসে শৈবলিনীর রূপমুগ্ধ চন্দ্রশেখর বিবাহের পর শৈবলিনীর প্রেমবুভুক্ষু হৃদয়কে উপেক্ষা করে গ্রন্থ অধ্যয়নেই কাল কাটিয়েছেন। এই গ্রন্থকীট পণ্ডিতের গৃহকর্মের সহায়িকারূপেই যেন শৈবলিনীর অবস্থিতি। এই আত্মভোলা, সংসারে উদাসীন পুরুষও একসময় শৈবলিনীর প্রতি তার উপেক্ষার জন্য মনোবেদনার চাপে পীড়িত হয়েছেন — "হায়! কেন আমি ইহাকে বিবাহ করিয়াছি। এ কুসুম রাজমুকুটে শোভা পাইত — শাস্ত্রানুশীলনে ব্যস্ত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের কুটীরে এ রত্ন আনিলাম কেন? আনিয়া আমি সুখী হইয়াছি, সন্দেহ নাই। কিন্তু শৈবলিনীর তাহাতে কি সুখ? আমার যে বয়স, তাহাতে আমার প্রতি শৈবলিনীর অনুরাগ অসম্ভব — অথবা আমার প্রণয়ে তাহার প্রণয়াকাঙ্খা নিবারণের সম্ভাবনা নাই। বিশেষ, আমিও সর্বদা আমার গ্রন্থ লইয়া বিব্রত, কিন্তু, আমি শৈবলিনীর সুখ কখন ভাবি? আমার গ্রন্থগুলি তুলিয়া পাড়িয়া এমন নবযুবতীর কি সুখ? আমি নিতান্ত আত্মসুখ পরায়ণ — সেই জন্যই ইহাকে বিবাহ করিতে প্রবৃত্তি হইয়াছিল। এক্ষণে আমি কি করিব? এই ক্লেশ সঞ্চিত পুস্তক রাশি জলে ফেলিয়া দিয়া আসিয়া রমনী মুখপদ্ম কি এ জন্মের সারভূত করিব? ছি, ছি, তাহা পারিব না, তবে কি এই নিরপরাধ শৈবলিনী আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিবে? এই সুকুমার কুসুমকে কি অতৃপ্ত যৌবনতাপে

দগ্ধ করিবার জন্যই বৃন্তচ্যুত করিয়াছিলাম ।" ১৫

এই সুদীর্ঘ আত্মবিশ্লেষণ চন্দ্রশেখরের মানসিক দ্বন্দ্বের পরিচায়ক । এখানেই শৈবলিনীর প্রতি এই গ্রন্থপ্রিয় পণ্ডিতের অনুরাগ সঞ্চার এবং তার অধ্যয়ন প্রিয়তার ওপরে শৈবলিনীর প্রাধান্য বিস্তারের সূচনা ।

'রাজ সিংহ' উপন্যাসের মবারক চরিত্রেও এই অন্তর্বেদনার পরিচয় পাওয়া গেছে । স্বজাতির সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে মবারকের গভীর হৃদয় বেদনার পীড়ন সুরু হয়েছে । তার প্রণয়াস্পদা শাহজাদী জাহানারার আদেশে সর্পাঘাতে তার মৃত্যুদণ্ড হলে মানিকলালের চেষ্টার পুনর্জীবন লাভের পর কৃতজ্ঞতা স্বরূপ মবারক মোগল সওদাগরের ছদ্মবেশে রাজসিংহের বিরুদ্ধে ঔরঙ্গজেবের বিশাল সৈন্য বাহিনীকে দিকভ্রান্ত করে বাদশাহী সেনার বিপর্যয় ও রাজপুত বাহিনীর জয়লাভের পথ প্রশস্ত করেন । রাণা রাজসিংহ তাকে পুরস্কৃত করতে চাইলে তিনি বলেন " আমি মোগল হইয়া মোগলের রাজ্য ধ্বংসের উপায় করিয়া দিয়াছি । আমি মুসলমান হইয়া হিন্দুরাজ্য স্থাপনের কার্য্য করিয়াছি । আমি সত্যবাদী হইয়া মিথ্যা প্রবঞ্চনা করিয়াছি । আমি বাদশাহের নেমক খাইয়া নেমক হারামী করিয়াছি । আমি মৃত্যু যন্ত্রণার অধিক কষ্ট পাইতেছি । আমার আর কোন পুরস্কারের সাধ নাই । আমি কেবল এক পুরস্কার আপনার নিকট ভিক্ষা করি । আমাকে তোপের মুখে রাখিয়া উড়াইয়া দিবার আদেশ করুন । আমার আর বাঁচিবার ইচ্ছা নাই ।" ১৬

এই আত্মধিক্কার , অন্তর্বেদনার গভীর পীড়ন যেন মবারক

১৫। বঙ্কিম রচনাবলী — (প্রথম খণ্ড) — সাহিত্য সংসদ .. পৃঃ ৪০৬

১৬। ঐ ঐ ঐ পৃঃ ৬১০ — ৬১১

চরিত্রের পৌরুষকে আরও প্রোজ্জ্বল করেছে ।

উপন্যাসে সন্ন্যাসী জাতীয় চরিত্রের উপস্থাপনা রচয়িতার বিশেষ মানসিকতার পরিচয়বাহী । কাহিনীর বিবর্তনে এ চরিত্রগুলির প্রভাব বা অবদান যথেষ্ট । ' দুর্গেশ নন্দিনীর ' অভিরাম স্বামী , 'কপালকুণ্ডলা'র কাপালিক , 'মৃণালিনীর' মাধবাচার্য্য , 'চন্দ্রশেখরের' রমানন্দ স্বামী , 'রজনী'র সন্ন্যাসী , 'রাজসিংহে'র রাজপুরোহিত অনন্ত মিশ্র , 'দেবী চৌধুরাণী'র ভবানী পাঠক , 'সীতারামে'র চন্দ্রচূড় তর্কালঙ্কার – সকলেই এই পর্যায়ের । ' আনন্দমঠ' উপন্যাসটিতে সন্ন্যাসীদেরই কার্যকলাপের বিবরণ । বিভিন্ন উপন্যাসের এই সব সন্ন্যাসী চরিত্রের সমষ্টিতে কাপালিক চরিত্রটি কোন প্রকার পূর্বাপর অনুসৃতি বিহীন এক বিশেষ স্বতন্ত্র পর্যায়ের ব্যক্তি । তাঁর পরিবেশ ও কার্যকলাপ আমাদের কাছে অপরিচিত বলেই বিশেষ বিস্ময় ও ভীতি বিহ্বলতা সৃষ্টি করে । অন্যান্য উপন্যাসের সন্ন্যাসীরা ব্যক্তির জীবনে পরম হিতার্থীরূপে উপস্থাপিত । তাঁদের প্রচেষ্টায় উপন্যাসের নায়ক বা প্রধান পুরুষ চরিত্রের জীবনের সমস্যা সমাধানে তৎপর হয়েছেন কিন্তু কাপালিক চরিত্রটি নবকুমার ও কপালকুণ্ডলার জীবনে অভিশাপ স্বরূপ । তাঁর রোষাগ্নি এদের মিলিত জীবনকে দগ্ধ করেছে ।

ব্যক্তি জীবনের শুভার্থী সন্ন্যাসী চরিত্রগুলিই যেন পরবর্তীকালে ধীরে ধীরে সমাজের কল্যাণব্রতে আত্মনিয়োগকারী রূপে চিত্রিত হয়েছেন । বঙ্কিমের উপন্যাসের পর্যায়গত বিবর্তনের দিকে দৃষ্টিপাত করলে এই চরিত্রগুলির বিবর্তন ও স্পষ্ট হয়ে ওঠে । কেবলমাত্র সামাজিক উপন্যাস দুটিতে এই সন্ন্যাসী জাতীয় চরিত্রের অবতারণা করা হয়নি । 'দুর্গেশ নন্দিনী'র অভিরাম স্বামী , 'চন্দ্রশেখরের রমানন্দ স্বামী , 'রাজসিংহে'র অনন্ত মিশ্র এদের শিষ্য , শিষ্যা বা প্রিয়জনের জীবনের সমস্যা সমাধানের দিকে প্রয়াসী হয়েছেন । কিন্তু মাধবাচার্য্য , ভবানী পাঠক , চন্দ্রচূড় ও ' আনন্দমঠে'র সন্ন্যাসী সম্প্রদায়

তাঁর কেবলমাত্র ব্যক্তিজীবনের সমস্যা নিয়ে ভাবিত নন। দেশও সমাজের কল্যাণ চিন্তায় তারা সদাসক্রিয়।

এই সন্ন্যাসী চরিত্রগুলি যে এই বাস্তব জগতেরই অধিবাসী, হয়ত সে পরিচয় দেখাবার জন্যই এদের মধ্যে সাধারণ মানব চরিত্রের অনুরূপ প্রবণতা দেখান হয়েছে। যেমন অভিরাম স্বামী —, তাঁর পূর্বপরিচয় একজন ভ্রষ্ট চরিত্রের পুরুষের অনুরূপ। সন্ন্যাসী জীবনের পূর্ব প্রস্তুতির কোন পরিচয় সেখানে নেই। তার পরবর্তী জীবনও তার কন্যা - জামাতা ও দৌহিত্রীর কল্যাণ চিন্তায় ব্যয়িত। বৃহত্তর জগতের হিতসাধন প্রয়াস তার মধ্যে কখনও দেখা যায়নি।

ভবানী পাঠক দস্যু সর্দার। তবে তার এই দস্যুবৃত্তি ব্যক্তিজীবনের প্রয়োজনে নয়, দরিদ্র জনগণের দারিদ্র্য দূরীকরণ প্রয়াসে।

ভবানন্দ — আনন্দ মঠের মাতৃমন্ত্রে দীক্ষিত সন্তান। তার মধ্যেও দেখা দিয়েছে নারীর রূপ আসক্তিজনিত পদস্খলন।

রমানন্দ স্বামীর যোগবল, মাধবাচার্যের জ্যোতিষ গণনা ইত্যাদির মধ্যে যে অলৌকিক বা দৈব ঘটনার প্রতি বিশ্বাসের পরিচয় বঙ্কিম দিয়েছেন তা বাস্তব জগতের উর্দ্ধে। কিন্তু সন্ন্যাসীরাও যে বাস্তব জগতের সঙ্গে সংযোগ বিহীন নন - তার প্রমাণই যেন ঐ মানবীয় ত্রুটি যুক্ত সন্ন্যাসী বা সন্ন্যাসী জাতীয় চরিত্রে তিনি দেখিয়েছেন।

বঙ্কিমের লেখনী ধারণের পশ্চাতে ব্যক্তি চরিত্র ও সমাজের কল্যাণ সাধন প্রয়াস বিশেষ কার্যকরী ছিল একথা পূর্বেই বলা হয়েছে। সংযম শাসিত জীবনে কিভাবে সুখী হওয়া যায় আর চরিত্রে অসংযম জীবনে কিভাবে ধ্বংসের পথ প্রস্তুত করে তারই যেন পরিচয়বাহী রূপে লেখকের নীতির

শাসনে শাসিত হয়েছে তাঁর সৃষ্ট পুরুষ চরিত্রগুলি । ঐতিহাসিক সামাজিক সব চরিত্রই ঔপন্যাসিকের এই লোক হিতসাধন প্রচেষ্টার নিদর্শনবাহী। কিন্তু উল্লেখযোগ্য এই যে , পুরুষ চরিত্রগুলি লেখকের আদর্শলোকের অধিবাসী হলেও মাটির জগতের সঙ্গে একেবারে সম্পর্ক শূন্য রূপে চিত্রিত হয়নি , তাই তাদের একেবারেই অবাস্তব বা কল্পলোকের অধিবাসী বলে মনে হয়না । ফলে উন্নত চরিত্রের পতনের জন্য পাঠক পরিচিত ব্যক্তির অধঃপতনের বেদনা অনুভব করে থাকে ।সমালোচক মোহিতলাল মজুমদার বঙ্কিমের চরিত্র সৃষ্টির এই কৃতিত্ব সম্পর্কেই বলেছেন – " বঙ্কিমের উপন্যাসে একদিকে যেমন চরিত্রবলের অত্যুচ্চ আদর্শ ঘোষণা , তেমনই অপর দিকে যাহাদের অধঃপতন হইতেছে তাঁহারাও প্রায় আদর্শ পুরুষ , — ভবানন্দের মতো ত্যাগী বীর সন্ন্যাসীরও পদস্খলন হয় , গোবিন্দলাল নগেন্দ্রনাথের ত কথাই নাই । তিনি দেহদশাধীন পুরুষের সেই নির্মম নিয়তিকে কোথাও অবজ্ঞা বা অস্বীকার করেন নাই । বরং সেই রক্তরশ্মির তুল্য প্রভায় পুরুষ চরিত্রগুলি আদ্যন্ত উদ্ভাসিত হইয়াছে ।" [১৭]

বঙ্কিমের অনুরূপ প্রতিভা বঙ্কিম যুগে অন্য কোন ঔপন্যাসিকের মধ্যে দেখা যায়না । তাই চরিত্র সৃষ্টিতে বঙ্কিমের মতো তৎপরতা এ যুগের অন্য কোন উপন্যাসে পাওয়া না গেলেও চরিত্রকে আদর্শায়িত করা এবং বাস্তব উপযোগী গুণের কিছুটা আরোপ এ যুগের লেখকদের রচনায় দেখা গেছে । তবে এ যুগের ঔপন্যাসিকরা উপন্যাসের কাহিনী নির্বাচন ক্ষেত্রে বিভিন্ন

১৭। বঙ্কিম বরণ — মোহিতলাল মজুমদার ... পৃঃ ৩১

পরিবেশের সঙ্গে পাঠককে পরিচিত করিয়েছেন। তার ফলে বঙ্কিম যুগের ঔপন্যাসিকদের রচনায় আমরা নানা পরিবেশের ও মানসিকতার বৈচিত্র্যের অধিকারী পুরুষ চরিত্রের সাক্ষাৎ পাই। এ যুগের ঔপন্যাসিকদের রচনায় বঙ্কিমের প্রভাব যে যথেষ্ট ক্রিয়াশীল তা বলাই বাহুল্য। পরবর্তী পরিচ্ছেদে এই লেখকদের হাতে পুরুষ চরিত্রের চেহারা কিরূপ নিয়েছে তার স্বরূপ সন্ধান করা হবে।

— দ্বিতীয় অধ্যায় — (দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ) —

বঙ্কিম যুগের অন্যান্য ঔপন্যাসিকদের রচনায় প্রধান পুরুষ চরিত্র :-

১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে বঙ্কিমচন্দ্র 'দুর্গেশনন্দিনী' উপন্যাস লিখে বাংলা সাহিত্যে একটি নতুন যুগের সূচনা করেছিলেন। তাঁর সর্বশেষ উপন্যাস 'সীতারাম' প্রকাশিত হয় ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে। এর পরে আরও কয়েক বছর তিনি তাঁর পূর্ববর্তী উপন্যাস গুলির সংস্কার সাধন কার্যে ব্যস্ত থেকেছেন। এই দীর্ঘকালের সাহিত্য সাধনায় বঙ্কিম নিজেও যেমন নানা রচনায় বঙ্গ সাহিত্যের সমৃদ্ধি সাধন করেছেন, তেমনি বাংলা সাহিত্যে এক নতুন লেখক গোষ্ঠী গড়ে তুলে বঙ্গসাহিত্যের সেই দুরবস্থার যুগে সাহিত্য সাধনার দ্বারা মাতৃভাষা ও সাহিত্যের উৎকর্ষোন্নতির পথ প্রশস্ত করে দিয়েছিলেন। প্রসঙ্গতঃ, এ যুগের অন্যতম প্রখ্যাত ঔপন্যাসিক রমেশচন্দ্র দত্তকে বাংলা সাহিত্যে আত্মনিয়োগ কার্যে বঙ্কিমের অনুপ্রেরণার কথা স্মরণ করা যেতে পারে। মহৎ প্রতিভা স্বাভাবিক ভাবেই তাঁর অনুরাগী ও অনুগামী দল সৃষ্টি করে, বঙ্কিমের ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। তবে বঙ্কিমের অনুসারী ও অনুগামী যে লেখক গোষ্ঠী সেদিন বঙ্গ উপন্যাসে বঙ্কিমের ধারাকেই এগিয়ে নিয়ে চলেছিলেন, তাঁদের মধ্যে যুগের মহত্তম প্রতিভাকে অতিক্রম করার ক্ষমতা কারোই প্রায় ছিল না বলা যায়। ফলে বঙ্কিম যুগে অসংখ্য ঔপন্যাসিক বাংলা উপন্যাসের সংখ্যা বৃদ্ধি করলেও বঙ্কিমের আদর্শকেই মূলতঃ বরণ করেছিলেন অবশ্য বৈচিত্র্যের সন্ধানও তাঁরা দিয়েছেন। রোমান্স প্রিয়তার আতিশয্যের জন্য যাঁরা সেদিন বঙ্কিমের উপন্যাসে দোষ দর্শনে তৎপর হয়েছিলেন, তাঁদের লেখনীও তেমন কোন অভিনব রচনার সন্ধান দেয়নি।

অবশেষে আর এক যুগোত্তীর্ণ প্রতিভার সৃষ্টি 'চোখের বালি'

বাংলা উপন্যাসের জগতে অভিনবত্বের চমক সৃষ্টি করল ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে। সেই সময় থেকেই উপন্যাসে বঙ্কিমের আদর্শ পরিবর্তনের পথে মোড় নিল। অবশ্য 'চোখের বালি' লেখার আগে রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিম যুগ প্রভাবে ঐতিহাসিক চরিত্র অবলম্বনে 'বৌঠাকুরাণীর হাট' ও 'রাজর্ষি' নামে দুটি উপন্যাস লিখেছিলেন। রচনার কালসীমায় এবং কাহিনী নির্বাচনে উপন্যাস দুটিতে বঙ্কিমের প্রভাব থাকলেও লেখকের দৃষ্টি ভঙ্গীর স্বতন্ত্র পরিলক্ষিত হয়। পরবর্তী অধ্যায়ে রবীন্দ্র উপন্যাসের পুরুষ চরিত্রের আলোচনা প্রসঙ্গে উক্ত উপন্যাসের পুরুষ চরিত্র সম্পর্কে বিশদ আলোচনার অভিপ্রায়ে এখানে কেবলমাত্র বঙ্কিমযুগের উপন্যাস হিসাবে এদের উল্লেখ করা হোল।

১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে 'দুর্গেশনন্দিনী' পাঠের পর ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে 'চোখের বালি' বাংলা উপন্যাস পাঠককে দ্বিতীয়বার চমৎকারিত্বের স্বাদ গ্রহণের সুযোগ দিয়েছিল। বঙ্কিম যুগের উপন্যাস বলতে আমরা এই সময় সীমায় রচিত উপন্যাসগুলিকেই গ্রহণ করব। রমেশচন্দ্র বসু[১] ও বঙ্কিম যুগ হিসাবে এই কালসীমাকে নির্দেশ করেছেন।

বঙ্কিমের উপন্যাসের পুরুষ চরিত্রের ঐশ্বর্য্য ও আভিজাত্যের উচ্চমঞ্চে অবস্থানকারী। নারীরূপ মুগ্ধতা বা রমণীপ্রেম জড় এদের জীবনে আর কোন জটিল সমস্যা সংকটের পরিচয় তেমন পাওয়া যায় না। পুরুষের নাগরিক জীবনযাত্রার চিত্র বা গতানুগতিক পল্লীজীবনে অভ্যস্ত দারিদ্র্য পীড়িত গ্রাম্য পুরুষ চরিত্র - উভয়ই বঙ্কিমের উপন্যাসে অনুপস্থিত। সুতরাং এদিক থেকে বঙ্কিমের পুরুষেরা সমাজের বৃহত্তর গোষ্ঠীর একটা অংশ মাত্রের প্রতিনিধি।

১। বঙ্কিমচন্দ্রের সমকালীন গৌণ ঔপন্যাসিকবৃন্দ — রমেশচন্দ্র বসু

কিন্তু তাঁর সমকালীন বিভিন্ন ঔপন্যাসিকদের রচনায় আমরা পরিবেশ পরিস্থিতি , শিক্ষা , পেশা , মানসিকতা ইত্যাদি বিভিন্ন ক্ষেত্রে বৈচিত্র্যময় পুরুষ চরিত্রের সঙ্গে পরিচিত হই । বঙ্কিমের উপন্যাসে সাধারণ মানুষের কথা উপেক্ষিত হয়েছে কিন্তু তাঁর যুগের অনেক ঔপন্যাসিকই সাধারণ মানুষের জীবন সমস্যার প্রতি আগ্রহী হয়েছেন । চরিত্র চিত্রণে বঙ্কিমের মতো দক্ষতা দেখাতে না পারলেও এবং রোমান্স প্রিয়তাকে প্রাধান্য দিলেও এ যুগের ঔপন্যাসিকেরা বিচিত্র কর্মা ও বিচিত্রধর্মা পুরুষের চরিত্রকে অবলম্বন করে পরবর্তীকালের উপন্যাসের চরিত্র সৃষ্টির সূচনা করে গেছেন বলা যায় । সমকালের প্রবণতা এ যুগের চরিত্র রচনায় স্বাভাবিক ভাবেই প্রভাববিস্তার করেছে , কিন্তু তারই মধ্যে ইঙ্গিত রয়ে গেছে আগামীকালের ।

ভূদেবের অনুসরণে বঙ্কিমচন্দ্র বাংলা ঐতিহাসিক উপন্যাসের যে স্বর্ণদুয়ার উন্মোচন করলেন তাঁর সমকালের লেখকরা স্বভাবতঃই সেই তোরণ পথে প্রবেশ করে ইতিহাসের বিভিন্ন অধ্যায়ের পট উত্তোলন কার্যে ব্রতী হয়েছিলেন । যে জাতীয়তা বোধ স্বদেশপ্রেম বঙ্কিমকে ঐতিহাসিক দূরত্বে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে অতীত গৌরব প্রচারে উন্মুখ করেছিল সেই প্রবণতা এ যুগের লেখকদের ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনার পশ্চাতেও ক্রিয়াশীল ছিল , তা বলাই বাহুল্য । তাই বঙ্কিম যুগে ঐতিহাসিক উপন্যাসের প্রাচুর্য্য দেখা যায় । এই যুগ প্রবণতা সম্পর্কে অচ্যুত গোস্বামী বলেছেন ;—

"বঙ্কিম যুগের সামনে সবচেয়ে বড় প্রশ্ন ছিল দেশপ্রেম ; প্রায় সাত - আটশো বছরের পরাধীনতার ফলে অধঃপতিত জড়তা গ্রস্ত একটি জাতির জীবনে নতুন প্রাণের জোয়ার ফিরিয়ে আনা । এ যুগে জাতীয় জীবনে যে গুণ গুলির অভাব ছিল , অথচ যে গুণগুলি একটি অগ্রসর স্বাধীনতা কামী জাতির পক্ষে অপরিহার্য্য তা হল আত্মবিশ্বাস ও আত্মমর্যাদা জ্ঞান , বীরোচিত আদর্শ এবং কঠিন নৈতিক ভিত্তি । স্বভাবতই এ কালের লেখক ঐতিহাসিক কালের মধ্যে

এই গুণ ও আদর্শগুলি অনুসন্ধান করেছেন এবং ঐতিহাসিক কাহিনী ও চরিত্রের মধ্যে তা-ই চিত্রিত করেছেন।"[১]

উনবিংশ শতকের উত্তরপর্বে জাতীয়তাবোধ ও স্বদেশ ভাবনার সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছিল হিন্দুত্ববোধ। দেশের অতীত ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধা, স্বজাতি ও স্বধর্মের প্রতি আন্তরিক নিষ্ঠা এই হিন্দুত্ব বোধের জাগরণে সহায়তা করেছিল। মধ্যযুগীয় সমাজের হিন্দুধর্মের আচার আচরণ সর্বস্ব রক্ষণশীল চেহারা পরিবর্তিত হয়ে নবজাগরণের ফলে সনাতন হিন্দু আদর্শের প্রচার ও প্রতিষ্ঠা এ যুগের অন্যতম উল্লেখযোগ্য ঘটনা। পরাধীন দেশের দুর্গতি মোচনে যাঁরা সেদিন সক্রিয় হয়ে উঠেছিলেন তাঁদের কাছে এদেশ যেন হিন্দুস্থান রূপেই প্রাধান্য পেয়েছিল। এর পেছনে কোন সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতার মনোভাব কার্যকরী হয়েছিল এমন কথা হয়ত বলা যায় না। বরং বহু জাতি ও সম্প্রদায়ে বিভক্ত, ধর্মীয় সঙ্কীর্ণতায় বিচ্ছিন্ন ভারতীয়দের নতুন জ্ঞানের আলোকে উদ্দীপিত করবার জন্য, একদেশ, এক জাতি, এক ধর্ম - এই বোধে উদ্বুদ্ধ করবার জন্যই যেন সনাতন হিন্দুধর্মের উদার মতবাদ সর্বসাধারণের মধ্যে প্রচার করার প্রবণতা দেখা গিয়েছিল।

তাছাড়া সেদিন পাশ্চাত্য শিক্ষার সংস্পর্শে যাঁরা এসেছিলেন, তাদের মধ্যে অধিকাংশই ছিলেন হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্রতিনিধি। মুসলমান সমাজে নব্য শিক্ষার ব্যাপক প্রসার তখনও হয়নি। ফলে নব্যশিক্ষিত সম্প্রদায় বিদেশী শিক্ষা - সভ্যতা - সমৃদ্ধি পূর্ণ জীবধারার পাশে আচার সর্বস্ব হিন্দু সমাজের বহুধা বিভক্ত মৃতকল্প চেহারাটা দেখে স্বজাতি ও স্বধর্মীয়দের দুরবস্থা দূরীকরণে স্বাভাবিক আন্তরিকতা বশে অগ্রণী হয়েছিলেন। বিশেষতঃ এদেশের

১। বাংলা উপন্যাসের ধারা — অচ্যুত গোস্বামী .... পৃঃ ৯১

দীর্ঘকালীন মুসলমান শাসনের স্মৃতিও খুব সুখপ্রদ ছিল না। তাই নব জাগরণের যুগে এদেশীয় মৃতপ্রায় সমাজকে সংস্কার করিতে গিয়ে যে সমাজ সংস্কার আন্দোলন-গুলি গড়ে উঠল সবই হিন্দু সমাজকেন্দ্রিক। মৃতপ্রায় জাতিকে নতুন জীবনবোধে উদ্বুদ্ধ করবার জন্য, অতীতের ঐতিহ্যকে স্মরণ করিয়ে দেবার জন্য ইতিহাসের পৃষ্ঠায় সন্ধানী দৃষ্টি ফেলে যে সব স্বাধীনতাকামী, স্বদেশ প্রেমিক আদর্শ বীর পুরুষদের চিত্র তুলে ধরা হোল তারাও মুসলিম শাসকের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত মহান হিন্দু পুরুষ। এ যুগের কাব্যে, নাটকে, উপন্যাসে হিন্দুর অতীত গৌরব গাথারই প্রাধান্য।

হিন্দুধর্মের আচার-সর্বস্ব, সংকীর্ণ, অনুদারনীতির প্রতিক্রিয়ায় ব্রাহ্মধর্মের প্রবর্তন হয়েছিল। কিন্তু যে রামমোহন রায় ব্রাহ্ম ধর্ম আন্দোলনের প্রধান পুরোধা ছিলেন তিনিও নিজেকে সনাতন, উদার হিন্দু ধর্মাদর্শে বিশ্বাসী বলেই মনে করতেন। সুতরাং কালক্রমে হিন্দু সমাজের সঙ্গে ব্রাহ্ম সমাজের বিচ্ছেদ নীতির তীব্রতা হ্রাস পেয়েছিল দেখা যায়।

বিদেশী শিক্ষা - সভ্যতার পাশে নিজেদের মৃতবীর্য, পরাভবম্লান, ক্ষয়িষ্ণু চেহারার জন্য বেদনাবোধ, অতীত ঐতিহ্যকে তুলে ধরে নিজেদের অতীত গৌরবের মাহাত্ম্য প্রচার, এ যুগের আত্মবিস্মৃত জাতিকে নতুন করে জেগে উঠবার প্রেরণা দিয়েছিল। যাঁরা সাহিত্যে এই প্রেরণাবোধকে প্রচারিত ও কার্যকরী করতে অগ্রণী হয়েছিলেন তাঁরাও অধিকাংশই হিন্দু সমাজেরই প্রতিভূ। এখানে হিন্দু সমাজ বলতে, সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িক মনোভাব মুক্ত, উদার পরমত সহিষ্ণু হিন্দু সমাজের কথাই বলা হচ্ছে।

সুতরাং বিদেশী শাসনের প্রতিক্রিয়ায়, নতুন শিক্ষা সংস্কৃতির সংস্পর্শে এসে ভারতে যে নবজাগরণ আন্দোলন সুরু হয় তার প্রথমিক বীজ বাংলাদেশেই উপ্ত হয়েছিল বলা যায়। নব্যশিক্ষিত বাঙালীই সেদিন

সুদীর্ঘকালের মধ্যযুগীয় তন্দ্রার অবসানে , নবজাগরণের প্রত্যূষে নতুন ঊষার আলোকে নিজেকে প্রথম অভিস্নাত করে , পরে ভারতের অন্যত্র সেই আলোক বর্তিকা বহন করে নিয়ে গিয়েছিল এ কথা বলা হয়ত অযৌক্তিক হবে না ।

বঙ্কিম যুগের উপন্যাসে আমরা এই নব জাগরিত বাঙালী পুরুষের পরিচয় পাই । যদিও বঙ্কিমের ও তাঁর যুগের ঔপন্যাসিকদের ঐতিহাসিক উপন্যাসের প্রধান পুরুষ চরিত্রগুলি অনেক ক্ষেত্রেই রাজপুত ও মারাঠা বীর জাতীয় , তবুও তাঁদের চরিত্রে সেকালের জাতীয়তাবোধের পরিপ্রেক্ষিতে বাঙালীর আকাঙ্খার রূপায়ণ হয়েছিল বলেই নবজাগরিত বাঙালীর মানস প্রতিভূ রূপে তাঁদের গ্রহণ করা যেতে পারে । যুগের আকাঙ্খার মূর্ত প্রকাশ বলেই ঔপন্যাসিকগণ এই সব ঐতিহাসিক চরিত্রে বীরত্ব , আদর্শবাদিতা , স্বধর্ম ও স্বজাতি প্রীতি , নীতিনিষ্ঠা ও স্বাধীনতা স্পৃহার অপূর্ব সমন্বয় ঘটিয়েছিলেন । ঊনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে বাঙালীর চিন্তা ভাবনায় স্বদেশ ও স্বজাতির প্রতি দায়িত্ব বোধ এবং বিদেশী শাসনের পরিপ্রেক্ষিতে দেশপ্রেমের ক্রমজাগরণ ঘটতে থাকে । এরই ব্যাপক বিস্তৃতি ১৮৬৭ - তে চৈত্র মেলা বা হিন্দুমেলার মাধ্যমে জাতীয় ভাবধারার উন্মেষ অপর দৃষ্টান্ত ১৮৮৫।৮৬ তে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা ও কলকাতায় কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশন ইত্যাদি নানা ঘটনা পঞ্জীর মধ্যে । চূড়ান্ত প্রতিক্রিয়া দেখা যায় ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে বঙ্গ ভঙ্গ আন্দোলনের মধ্যে , সরকারী প্রস্তাবের তীব্র বিরোধিতায় ।

দেশের এই উত্তাল ঘটনাবলীর মধ্যে যে স্বদেশ প্রীতি ও জাতীয় ভাবধারার বিকাশ প্রকাশ দেখা যাচ্ছিল তাতে দেশবাসীর স্বতঃস্ফূর্ত শ্রদ্ধার পাত্র ও আকাঙ্খিত দেশপ্রেমিক রূপে রাজপুতবীর রাণা প্রতাপ সিংহ ও অন্যান্য রাজপুত বীরগণ এবং মারাঠা বীর ছত্রপতি শিবাজী , বাংলার বার ভূঁইঞার অন্যতম প্রতাপাদিত্য ও বাংলাদেশের অন্যান্য আদর্শ নৃপতিগণও ঔপন্যাসিকদের

রচনায় আদর্শ পুরুষ চরিত্র হিসাবে গৃহীত হয়েছিলেন।

ভূদেবের 'অঙ্গুরীয় বিনিময়' উপন্যাসে (১৮৫৭) আমরা শিবাজীর জাতীয় ভাবনার সংগে নারীপ্রেমের সংঘাতের চেহারা দেখেছি। কালীকৃষ্ণ লাহিড়ীর 'রোশিনারা' (১৮৬১) উপন্যাসে শিবাজীর সেই প্রেম সংকটের চিত্রই প্রাধান্য পেয়েছে। কিন্তু তাঁর সুগভীর দেশপ্রেম, জাতীয়তাবোধ, হিন্দুধর্ম্ম রক্ষায় ও প্রসারে আত্মোৎসর্গের অভিলাষ মূর্ত হয়ে উঠেছে রমেশচন্দ্র দত্তের 'মহারাষ্ট্র জীবন প্রভাত' (১৮৭৮) উপন্যাসে। গ্রন্থরচনাকালে লেখক পরাধীন দেশের যে সমস্যা ও সংকট প্রত্যক্ষ করেছিলেন, যে জাতীয় ভাবনার জাগরণ দেশের সর্ব্বত্র পরিলক্ষিত হয়েছিল এবং সেই নবজাগ্রত জাতির সম্মুখে যে ধরণের মহান্ চরিত্র উদ্দীপনা সৃষ্টিতে সক্ষম বলে মনে করেছিলেন, 'শতবর্ষ' অভিহিত উপন্যাস চতুষ্টয়ে তিনি সেই জাতীয় আদর্শ চরিত্রকেই উপস্থাপিত করেছেন। এই উদ্দেশ্য সম্বন্ধে 'মহারাষ্ট্র জীবন প্রভাত' উপন্যাসে তিনি জানিয়েছেন —

" পাঠক ! একত্র বসিয়া এক একবার প্রাচীন গৌরবের কথা গাইব, আধুনিক রাজপুত ও মহারাষ্ট্রীয় বীরত্বের কথা স্মরণ করিব, কেবল এই উদ্দেশ্যে লেখনী ধারণ করিয়াছি।"[৩] মোগল সেনাপতি রাজপুত বীর যশোবন্ত সিংহকে — 'হিন্দুরাজ তিলক', 'ক্ষত্রিয় কুলাবতংস', 'সনাতন হিন্দুধর্ম্মের স্তম্ভ স্বরূপ' — ইত্যাদি বিশেষণে ভূষিত করে শিবাজী তাঁকে স্বজাতি ও স্বধর্ম্ম রক্ষায় যেভাবে অনুপ্রাণিত করেছেন এবং মহারাজ জয় সিংহের সঙ্গে স্বধর্ম্মরক্ষার বিষয়ে যে যুক্তিপূর্ণ অথচ আবেগ সমৃদ্ধ আলোচনা করেছেন তাতে শিবাজীর গভীর জাতীয়তাবোধ ও স্বধর্ম্মনিষ্ঠার পরিচয় পাওয়া যায়। এই

৩। উপন্যাস গ্রন্থাবলী — রমেশ চন্দ্র দত্ত (হিতবাদী কার্য্যালয় প্রকাশিত) পৃঃ ২৮২

উপন্যাসের নায়ক ত্রয়োদশ বর্ষীয় রাজপুতবীর রঘুনাথজীর চরিত্রে যে সাহস, বীরত্ব ও প্রত্যুৎপন্ন মতিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়, যশোবন্ত সিংহ ও জয়-সিংহের কথায় রাজপুত জাতির যে সত্যনিষ্ঠা ও বীরত্বের পরিচয় রয়েছে তারই আরও বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে 'রাজপুত জীবন সন্ধ্যা' উপন্যাসে (১৮৭১)। এই উপন্যাসে ইতিহাস প্রসিদ্ধ রাজপুতবীর রাণা প্রতাপ সিংহের গভীর স্বদেশ প্রেম, স্বাধীনতারক্ষার জন্য সুদৃঢ় সঙ্কল্প ও কঠোর কৃচ্ছসাধনের যে পরিচয় লেখক ফুটিয়ে তুলেছেন তা যে কোন স্বাধীনতাকামী জাতির পক্ষে সাদরে বরণীয় হবে সন্দেহ নেই। ঐতিহাসিক উপন্যাস চতুষ্টয়ে কয়েকটি উজ্জ্বল, আকর্ষণীয় পুরুষ চরিত্র অঙ্কন করে রমেশচন্দ্র দত্ত রাজপুত বীরত্বের অতীত গৌরবের প্রতি তাঁর গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন। সেই সঙ্গে পাঠকও রাজপুত এবং মারাঠা বীরদের দৃপ্ত ব্যক্তিত্বকে গভীর বিস্ময়ে অবলোকন করে। 'বঙ্গ বিজেতায়' (১৮৭৪) আমরা বীরত্ব ও হিন্দুত্ববোধের পরিচয় পাই, পরবর্তী উপন্যাস 'মাধবী কঙ্কণ' (১৮৭৭) - এ ভাগ্য বিড়ম্বিত নরেন্দ্রের চরিত্রমধ্যে লেখক যে হিন্দুত্ববোধ প্রকাশ করেছেন, তার মূলেও রয়েছে রাজপুত বীরত্বের প্রেরণা। চারণের মুখে রাজপুতগণের অতীত গৌরব গাথা শ্রবণে নরেন্দ্র স্বদেশের দুরবস্থার জন্য যে বেদনাবোধ করে তার মধ্যে লেখক সমকালীন জাতীয় ভাবনার প্রকাশ ঘটিয়েছেন —

" নরেন্দ্র ভাবিতে লাগিলেন,— স্বদেশেও মহাবল পরাক্রান্ত রাজারা আছেন, তবে সুদূর বঙ্গদেশের এ দুর্দ্দশা কেন ? যুদ্ধই রাজপুতদিগের ব্যবসা, বালক, বৃদ্ধ, সকলেই যুদ্ধ শিক্ষা করে, তাহারা ধন দিয়াছে, ঐশ্বর্য্য দিয়াছে, প্রাণ দিয়াছে, তথাপি স্বাধীনতা বিসর্জ্জন দেয় নাই। তাহাদের গ্রাম দগ্ধ হইয়াছে, নগর লুণ্ঠিত হইয়াছে, দুর্গ শত্রুহস্তে পতিত হইয়াছে, তথাপি তাহারা গৌরব বিসর্জ্জন দেয় নাই। সে গৌরব গীত আজিও মরুবল্লীর কন্দরে ও উপত্যকায় প্রতিধ্বনিত হইতেছে। আর বঙ্গদেশ !

বেগপ্রবাহিণী পর্ণানদী তাহার গৌরব গীত গায় না , ব্রহ্মপুত্র স্বাধীনতার গীত গায় না , রাজা প্রজা সকলেই বড় সুখে নিদ্রা যাইতেছে । জগতে তাহাদিগের নাম নাই , বীরমণ্ডলীর মধ্যে তাহাদিগের স্থান নাই ।"[৪]

সপ্তদশ শতাব্দীর এক দুর্ভাগা পীড়িত বাঙালী যুবকের এই সুদেশে চিন্তা লেখকের সমকালে অর্থাৎ ঊনবিংশ শতকের শেষার্দ্ধে যে জাতীয়তাবোধ ও দেশপ্রীতি জাগরিত হয়েছিল তারই সমতুল । উপন্যাসটিতে যশোবন্ত সিংহের বীরত্ব , কর্ত্তব্যনিষ্ঠা , প্রভুর প্রতি আনুগত্য সুচিত্রিত হয়েছে । এই মহাবীরকেই আবার আমরা 'মহারাষ্ট্র জীবন প্রভাত' উপন্যাসে শিবাজীর সঙ্গে কথোপকথনে সুধর্ম্মনিষ্ঠরূপে দেখতে পাই ।

'বঙ্গবিজেতা' ও 'মাধবী কঙ্কণের' কাল্পনিক চরিত্রগুলি বঙ্কিমের উপন্যাসের চরিত্রের কথা মনে করিয়ে দিলেও এদের ব্যক্তিত্ব ততখানি আকর্ষণীয় রূপে চিত্রিত হয়নি । তবুও 'বঙ্গবিজেতার' নায়ক ইন্দ্রনাথ অপেক্ষা 'মাধবী কঙ্কণের' নরেন্দ্রনাথ জমিদার পিতার একমাত্র পুত্র হয়েও পিতৃবন্ধুর ষড়যন্ত্রে সম্পত্তি হারিয়ে জীবনে যে বিপত্তির সম্মুখীন হয়েছে এবং তার জীবনে প্রেম সংকট যে ভাবে তাকে বিভিন্ন পরিস্থিতির সামনে এগিয়ে নিয়ে গেছে তাতে চরিত্রটির আবেগ সর্ব্বস্ব চেহারা আমাদের সহানুভূতি উদ্রেক করে । জমিদার শাসিত মধ্যযুগীয় বাংলা দেশে এমন ভাগ্যবঞ্চিত জমিদার তনয়ের সাক্ষাৎ দুর্লভ ছিলনা । বঙ্কিমের আয়েষা - ওসমান - জগৎ সিংহের প্রেম সংকট রমেশচন্দ্রের ইন্দ্রনাথ - বিমলা - শকুনির জীবনের প্রেম সমস্যা ক্ষেত্রে স্মরণ হয় । আবার জগৎ সিংহের প্রতি আয়েষা ও তিলোত্তমার অনুরাগ রাজপুত্রের জীবনে যে জটিলতা সৃষ্টি করেছিল , ইন্দ্রনাথকে কেন্দ্র করে সরলা

৪। উপন্যাস গ্রন্থাবলী — রমেশ চন্দ্র দত্ত (হিতবাদী কার্য্যালয় প্রকাশিত)
পৃঃ .. ১৫৭ - ১৫৮

ও বিমলার অনুরাগ তদনুরূপ হলেও জগৎ সিংহের তুলনায় ইন্দুনাথে যেন রোমান্স প্রিয়তার আধিক্য অনুভূত হয়। বঙ্কিমের প্রতাপ - শৈবলিনী চন্দ্রশেখরের ত্রিভুজ প্রণয় সংকট রমেশচন্দ্রের নরেন্দ্র - হেমলতা - শ্রীশের প্রণয় সমস্যার চিত্রণে প্রভাব বিস্তার করেছে বলে মনে হলেও প্রতাপের দৃপ্ত ব্যক্তিত্ব নরেন্দ্রের মধ্যে অলক্ষিত। শ্রীশের মৌন প্রণয়, গ্রন্থ সর্বস্ব চন্দ্রশেখরের জীবনে নারীপ্রেমের জাগরণের পাশে সমান ভাবে আলোচ্য বলে মনে হয় না। 'মাধবী কঙ্কণের' লেখক ত্রিভুজ প্রণয়ের জটিলতা সৃষ্টির সুযোগ গ্রহণ করেননি। প্রবঞ্চক পিতৃ বন্ধু নবকুমার কর্তৃক নরেন্দ্র বিতাড়িত হওয়ায় শ্রীশের সঙ্গে হেমের বিবাহে কোন জটিলতা সৃষ্টি হয়নি। নরেন্দ্রের প্রতি হেমের প্রণয় ভাবনাও ক্রমে পরিবর্তিত হয়ে সমস্যা সমাধানের সহজ পথ উদ্ভাবনে সহায়ক হয়েছে। শ্রীশের বিবাহিত পত্নী হেম অনায়াসেই পূর্ব প্রণয়ী নরেন্দ্রকে 'ভাই' হিসাবে গ্রহণ করতে সম্মত হয়েছে এবং তার প্রণয়োপহার মাধবী কঙ্কণ যমুনা জলে হয়েছে বিসর্জিত। চন্দ্রশেখর ও প্রতাপের চারিত্রিক দৃঢ়তা ও প্রেমের দ্বন্দ্ব শ্রীশ ও নরেন্দ্রের চরিত্রে অনুসৃত হয়নি। বরং বঙ্কিমের গোবিন্দলালের মতোই হতভাগ্য নরেন্দ্রনাথ অবশেষে সন্ন্যাস জীবনে শান্তি লাভের পথ অনুসন্ধানে তৎপর হয়েছে।

'বঙ্গ বিজেতা' উপন্যাসের খল চরিত্র শকুনি তার প্রভুর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা, তীব্র বিষয়লালসা নিয়ে স্বভাব দুর্বৃত্ত রূপে চিত্রিত হয়েছে। বঙ্কিমের উপন্যাসে আমরা এমন আদ্যন্ত হীন চরিত্রের সাক্ষাৎ পাই না। এ জাতীয় নীচ পুরুষ চরিত্রে নারীর প্রতি প্রেম অপেক্ষা ভোগাকাঙ্ক্ষাটাই প্রধান। বিমলার প্রতি তার প্রেম নিবেদন ও জোর করে বিবাহ প্রচেষ্টায় তার নিদর্শন। সর্বদেশে, সর্বকালে প্রভুর প্রতি বিশ্বাসঘাতক, শঠ, কূটকৌশলী যে পুরুষ চরিত্র দেখা যায়, শকুনি চরিত্র তাদেরই প্রতিনিধি। 'আলালের ঘরের দুলালে' ঠকচাচার ক্ষেত্রে যেমন ন্যায় বিধান অনুযায়ী দণ্ডের ব্যবস্থা হয়েছে শকুনির ক্ষেত্রেও লেখক সেই নীতির শাসনে অকৃতজ্ঞ ব্যক্তিটিকে আত্মহত্যা দ্বারা

জীবনাবসান করতে বাধ্য করিয়েছেন ।

'মাধবী - কঙ্কণে'র নবকুমার চরিত্রে আমরা কিন্তু এই নীতির শাসন দেখতে পাই না । বন্ধুর জমিদারী হস্তগত করে অবশেষে বন্ধু পুত্রকেই সম্পত্তিচ্যুত করার উদ্দেশ্যে বিজড়িত করায় যে চারিত্রিক নীচতার পরিচয় নবকুমার দিয়েছে তার নিদর্শন সে যুগের সমাজে দুর্লভ ছিল না । এই প্রবঞ্চক ব্যক্তিটি অমাত্য ও দেওয়ান পদ থেকে জমিদার রূপে উন্নীত হয়ে অসাধারণ বুদ্ধি চাতুর্যের পরিচয় দিয়েছে । সমকালীন জাতীয়তাবাদের প্রেরণায় ইতিহাস প্রসিদ্ধ বীর পুরুষ চরিত্র অবলম্বনে উপন্যাস রচনার প্রবণতা প্রাক্ বঙ্কিম যুগে ভূদেবের 'অঙ্গুরীয় বিনিময়' এ , বঙ্কিমচন্দ্রের ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলিতে ও বঙ্কিমযুগের অনেক ঔপন্যাসিকের রচনায় পরিলক্ষিত হয় । এই সব উপন্যাসে অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রধানতঃ বহির্বঙ্গের জাতীয়তাবাদী আদর্শ বীর পুরুষ চরিত্র অবলম্বিত হয়েছে । কিন্তু বঙ্কিম যুগের কোন কোন ঔপন্যাসিক ঐতিহাসিক চরিত্র অনুসন্ধানের জন্য কেবলমাত্র রাজপুত - মারাঠা বীর পুরুষের চেহারা অঙ্কিত না করে বাঙালী চরিত্রও উপস্থাপন করেছেন । দূরত্বের মোহ অতিক্রম করে বাঙালী লেখকরা যে নিজের ঘরের অতীত সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠতে সুরু করেছিলেন , এ প্রবণতায় তার ইঙ্গিত বিদ্যমান । প্রতাপ চন্দ্র ঘোষের 'বঙ্গাধিপ পরাজয়' (প্রথম খন্ড — ১৮৬১ , দ্বিতীয় খন্ড — ১৮৮৫), রবীন্দ্রনাথের 'বৌঠাকুরাণীর হাট' (১৮৮৩) ও 'রাজর্ষি' (১৮৮৭) প্রভৃতি আরও অনেক উপন্যাসের চরিত্র সমূহ এ প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে ।

উল্লেখযোগ্য বিষয় হচ্ছে , ঐতিহাসিক উপন্যাসে আদর্শ বীর স্বদেশপ্রেমিক পুরুষ চরিত্র অঙ্কনের যে প্রচেষ্টা প্রাক্ বঙ্কিম যুগ থেকে বঙ্কিমচন্দ্রের মধ্যদিয়ে বঙ্কিমযুগ পর্যন্ত প্রসারিত হয়েছিল 'বঙ্গাধিপ পরাজয়' ও 'বৌঠাকুরাণীর হাট' এ উপস্থাপিত প্রতাপাদিত্য চরিত্রে তার ব্যতিক্রম

দেখা যায় । জাতীয়তাবাদী আদর্শ পুরুষ চরিত্রের মহানুভবতার পরিবর্তে এখানে কূট কৌশলী সন্দিগ্ধচিত্তের সংকীর্ণ নীচতার বহু নিদর্শন পাওয়া যায় । ঐতিহাসিক পুরুষ চরিত্রের বৈচিত্র্য ময়তার দিক থেকে উপন্যাসদ্বয়ে এরূপ চরিত্র সৃষ্টির প্রয়াস কৌতূহল উদ্রেক করে ।

বঙ্কিমচন্দ্রের 'সীতারাম' উপন্যাসে (১৮৮৭) আমরা মহৎ গুণযুক্ত বাঙালী নৃপতির সঙ্গে প্রথম পরিচিত হয়েছি । সেই আদর্শেরই অনুবৃত্তি হরণ চন্দ্র রচিতের 'বঙ্গের শেষ বীর' উপন্যাসে (১৮৯৭) । এখানে কিন্তু প্রতাপাদিত্যকে স্বদেশ প্রেমিক , বীর পুরুষরূপেই চিত্রিত করা হয়েছে । বাংলাদেশের জাতীয় অভ্যুদয়ে প্রতাপাদিত্য চরিত্র বীরত্ব ও দেশপ্রেমের জন্য বিশেষ মর্যাদা লাভ করেছিল -- 'বঙ্গের শেষ বীর' উপন্যাসে তারই প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠেছে ।

রমেশচন্দ্র দত্তের 'রাজপুত জীবন সন্ধ্যা'য় রাণা প্রতাপের শৌর্য্য - বীর্য্য ও গভীর স্বদেশানুরাগের পরিচয় তুলে ধরা হয়েছিল । দামোদর মুখোপাধ্যায়ের 'প্রতাপ সিংহ' (১৮৮৪) উপন্যাসেও সেই প্রয়াস দেখা যায় ।

এ যুগের প্রধান মহিলা ঔপন্যাসিক স্বর্ণকুমারী দেবী ও যুগপ্রবণতা অনুসরণে ইতিহাস প্রসিদ্ধ পুরুষ চরিত্র অবলম্বনে ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখেছিলেন । চৌহানের যুদ্ধে হিন্দুশক্তির বিপর্যয় ও ভারতে যবন আধিপত্যের সূচনা এই ঘটনা অবলম্বনে লিখিত 'দীপনির্ব্বাণ' (১৮৭৬) উপন্যাসের উপহার পত্রে লেখিকার বেদনার প্রকাশ যেন ঊনবিংশ শতকের ভারতে আর এক দুর্ভাগ্যের দিনের স্মরণে পরাধীনতার বেদনা বোধকেই স্পষ্ট করে তুলেছে --

" আর্য্য অবনতি কথা পড়িয়ে পাইবে ব্যথা
বহিবে নয়নে তব শোক অশ্রু ধার ,
কেমনে হাসিতে বলি সকলি গিয়েছে চলি
ঢেকেছে আর - ভানু ঘন মেঘজাল
নিভেছে সোনার দীপ ভেঙেছে কপাল ।" ৫

ভারতের জাতীয় জীবনে সেই আর এক দুর্ভাগের দিনে যে বীরপুরুষগণ প্রাণপণ চেষ্টায় স্বদেশ রক্ষায় তৎপর হয়েছিলেন সেই পৃথ্বীরাজ , সমর সিংহ , কিরণ সিংহ , কল্যাণ , চাঁদ কবির চরিত্র লেখিকা তাদের বিশিষ্ট গুণাবলী সহ 'দীপ নির্ব্বাণ' উপন্যাসে (১৮৭৬) তুলে ধরেছেন । যে গৃহশত্রু বিভীষণের দল বিদেশী শত্রুর সঙ্গে মিলিত হয়ে স্বদেশের সর্ব্বনাশ সাধনে তৎপর হয়েছিল পৃথ্বীরাজের মন্ত্রীপুত্র বিজয় সিংহ ও জয়চন্দ্র সেই দলের প্রতিনিধি । জাতীয় জীবনের বিপর্যয়ে হীন কূট কৌশল জাল বিস্তারী , বিশ্বাসঘাতক পুরুষের চরিত্র প্রায় সমস্ত ঐতিহাসিক উপন্যাসেই পাওয়া যায় । কোথাও নারীরূপ লালসা , কোথাও সাম্রাজ্য লোভ , কোথাও বা স্বার্থসাধনের হীন মনোভাব চরিত্রগুলির জঘন্য বিশ্বাসঘাতকতার মূলে কার্যকরী দেখা যায় । 'দীপ নির্ব্বাণ' উপন্যাসেও পৃথ্বীরাজ দুহিতা উমাবতীর প্রতি মন্ত্রীপুত্র বিজয়ের আসক্তি এবং সমর সিংহের পুত্র কল্যাণের প্রতি রাজকন্যার প্রেম যে ত্রিভুজ প্রণয়ের সংকট সৃষ্টি করেছে সেখানেই বিজয় সিংহের বিশ্বাস ঘাতকতার বীজ অঙ্কুরিত হবার সুযোগ পেয়েছে বলা যায় ।

যবন সৈন্যাধ্যক্ষ মহম্মদ ঘোরী দুবার পৃথ্বীরাজের কাছে পরাজয়ের পরে সন্ধির শর্তভঙ্গ করে , বিশ্বাসঘাতক বিজয় সিংহের সাহায্যে ,

---

৫। দীপনির্ব্বাণ — স্বর্ণকুমারী দেবী .... পৃঃ /.

হীন কৌশলে , অন্যায় যুদ্ধে উদারচেতা — আদর্শ ক্ষত্রিয়বীর পৃথ্বীরাজকে যেভাবে বন্দী ও হত্যা করেছেন তার মধ্যেই যবন শাসকদের চরিত্রের কলঙ্কিত দিকটির পরিচয় অভিব্যক্ত হয়েছে । রমেশ দত্তের 'মাধবী কঙ্কণ' ও 'মহারাষ্ট্র জীবন প্রভাতে' এবং বঙ্কিমের 'রাজসিংহ' উপন্যাসে আমরা আওরঙ্গজীব চরিত্রে যে চাতুরী ও প্রবঞ্চনা , — সন্ধির গর্ভভঙ্গ ইত্যাদি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের পরিচয় পেয়েছি ভারতে যবন সাম্রাজ্য স্থাপক মহম্মদ ঘোরীর চরিত্রে তারই পূর্বাভাস দেখা যায় । স্বর্ণকুমারী দেবীর 'মিবাররাজ' (১৮৮৭) ও 'বিদ্রোহ' (১৮৯০) উপন্যাস দুটিতে রাজপুত পুরুষের পাশে ভীল পুরুষদের চরিত্র অভিব্যক্ত হয়েছে । বাংলা উপন্যাসে অনভিজাত ভীলদের জীবন কথা পাঠকের বৈচিত্র্য পিপাসু আগ্রহকে তৃপ্ত করে । শিলাদিত্যের পুত্র গুহার প্রতি ভীলরাজ মন্দালিকের গভীর অপত্যস্নেহ ও কর্তব্যবোধ ভীল পুরুষদের জীবনে ঔদার্য ও মহানুভবতার পরিচয়বাহী ।

'বিদ্রোহ' উপন্যাসের ভুমিয়া চরিত্রটি 'মেবাররাজে'র মন্দালিক চরিত্রেরই পূর্ণতর রূপ বলা যায় । মন্দালিক ভীলরাজ হলেও রাজপুত্র গুহাদিত্যকে রাজত্ব দান করে নিজ পুত্রকে বঞ্চিত করতে দ্বিধা করেনি । আবার ভুমিয়ার ক্ষেত্রে দেখা যায় , সে পিতা ও ভীলদের এবংশের বিরোধিতা সত্ত্বেও রাজা নাগাদিত্যের প্রিয়পাত্র হয়ে রাজার অন্তিম অনুরোধ রক্ষার্থে রাজ পরিবারকে ভীলদের আক্রমণ থেকে রক্ষা করতে গিয়ে মৃত্যুবরণ করেছিল । স্নেহে , প্রেমে , কর্তব্য নিষ্ঠায় , প্রভুভক্তিতে ভীল পুরুষগণ যে অভিজাত ও উন্নত পুরুষ সমাজের থেকে কোন অংশেই হীন নয় উপন্যাস দুটিতে আমরা তার পরিচয় পাই । 'দীপনির্মাণে'র পুরুষদের সামনে দেশের সংকট মোচনের চেষ্টাই ছিল প্রধান সমস্যা । ব্যক্তিগত জীবনের প্রেম - ভালবাসা সেখানে গৌণ হয়ে পড়েছে । কিন্তু ' মিবাররাজ'ও 'বিদ্রোহ' উপন্যাসের পুরুষদের সামনে দেশের কোন গভীর সংকট দূরীকরণের সমস্যা দেখা দেয়নি । স্নেহ - ঈর্ষা - নারীপ্রেম

প্রণয় স্নেহ,কর্তব্য বোধ ইত্যাদি ব্যক্তিগত সমস্যার সবটাই পুরুষদের জীবনে জটিলতা সৃষ্টি করেছে ।

' ফুলের মালা' (১৮৯৫) উপন্যাসের ঘটনাস্থল গৌড় অর্থাৎ বঙ্গদেশ । এর আগে উপন্যাসে বাঙালী বীর প্রতাপাদিত্য , সীতারাম ইত্যাদি চরিত্রকে আমরা পেয়েছি । এখানে পেলাম রাজা গণেশকে । গণেশদেবের বাল্য প্রণয়িণী শক্তি ঘটনাচক্রে বিধর্মী যবন স্ত্রী হয়ে পূর্ব প্রণয়ীকে প্রেম নিবেদন করতে গিয়ে ব্যর্থ হয় । গণেশদেব শক্তির প্রতি তার প্রেমকে সংযত করে স্ত্রীর কাছেই তাকে ফিরে যাবার নির্দেশ দিয়ে প্রেমের মহত্ত্ব ও চারিত্রিক বলিষ্ঠতা পরিচয় রেখেছেন । বঙ্কিমযুগে যে আদর্শনিষ্ঠ ঐতিহাসিক পুরুষ চরিত্র সৃষ্টির নিদর্শন রয়েছে গণেশ দেবের চরিত্র তাদেরই সমগোত্রীয় । তবে পরিবেশের দিক থেকে আমরা সুদূর রাজস্থান বা মহারাষ্ট্র থেকে নিকটবর্তী ও পরিচিত পরিবেশের পুরুষ চরিত্রের সঙ্গে এখানে পরিচিত হই ।

ঐতিহাসিক উপন্যাস সমূহের পুরুষ চরিত্রগুলির মধ্যে স্থানগত ও কালগত এই দূরত্বকে পরিহার করে অপেক্ষাকৃত নিকটবর্তীকালের পুরুষ চরিত্রকে উপস্থাপিত করেছেন চন্ডীচরণ সেন তাঁর 'মহারাজ নন্দকুমার' (১৮৮৫) , 'দেওয়ান গঙ্গা গোবিন্দ সিংহ' (১৮৮৬) , 'অযোধ্যার বেগম' (১৮৮৬) এবং 'ঝান্সীর রাণী' (১৮৮৮) উপন্যাসে ।

মুসলমান শক্তির অবসান ও ইংরেজ রাজত্বের সূচনায় বঙ্গদেশে যে নৈরাজ্য সৃষ্টি হয়েছিল তার পরিচয় বঙ্কিমের 'চন্দ্রশেখর' , 'আনন্দমঠ' , 'দেবী চৌধুরাণী' উপন্যাসে আমরা পেয়েছি । সেই নৈরাজ্যের যুগে ক্ষমতাসীন ব্যক্তির চরিত্রে যে নীচতা দেখা দেওয়া সম্ভব এবং সাধারণ জনগণের জীবনে যে দুর্বিপাক সৃষ্টি ও প্রতিকারহীন অত্যাচার অনুষ্ঠিত হতে পারে তার পরিচয় চন্ডীচরণ সেনের প্রথম দুইটি উপন্যাসে বর্ণিত হয়েছে ।

এর আগের আলোচনায় আমরা দেশের দুর্দিনে দেশহিত ব্রতধারী আদর্শ পুরুষ চরিত্রের পরিচয় পেয়েছি । এখানে পাচ্ছি দেশে বিপর্যয় সৃষ্টিকারী পুরুষ চরিত্র ।

বঙ্কিমের 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসে লরেন্স ফস্টার, আমিয়ট, জনসন ইত্যাদি নীতিজ্ঞানহীন ইংরেজ পুরুষের চরিত্র চিত্রিত হয়েছে । চরিত্রগুলিতে সম্ভাব্য বাস্তবতা রক্ষিত হলেও এরা কাল্পনিক । কিন্তু চন্ডীচরণ সেনের উপন্যাসে এদেশে ব্রিটিশ শক্তির ভিত্তি সুদৃঢ়কারক কুখ্যাত ওয়ারেন হেস্টিংসের চরিত্র ঐতিহাসিক সত্যানুযায়ী উপস্থাপিত হয়েছে । বাংলা উপন্যাসে ঐতিহাসিক ইংরেজ পুরুষের সমস্ত জঘন্য তার পরিচয় সম্ভবতঃ এই প্রথম প্রকাশিত হোল । ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বাংলা - বিহার - উড়িষ্যার দেওয়ানি লাভ করে এদেশীয় কিছু অনুগৃহীত কর্মচারীদের সাহায্যে দেশে নির্মম অত্যাচারের যে প্রণালী অনুসরণ করেছিলেন তারই প্রেক্ষাপটে পুরুষ চরিত্রগুলি চিত্রিত হয়েছে ।

বৃটিশ শাসন পত্তনের আমলে শাসক শক্তির নির্মম অত্যাচারের প্রতিবাদ ও প্রতিকার প্রচেষ্টায় ব্রতী মহারাজ নন্দকুমারের চরিত্র এদেশের জাতীয় আন্দোলনে বিশেষ স্মরণীয় । 'আনন্দমঠ' উপন্যাসের উপসংহারে বঙ্কিমচন্দ্র ইংরেজ শাসনকে এদেশের পক্ষে শুভঙ্কর প্রদ বলেই অভিহিত করেছিলেন । কিন্তু এখানে দেশে অরাজকতা সৃষ্টি, দুর্যোগপূর্ণ পরিস্থিতিতে দেশবাসীর ওপর নির্বিচারে অত্যাচার চালিয়ে কৃষক, তাঁতি, বণিকদের সর্বস্বান্ত করার প্রচেষ্টা এবং সর্বোপরি হেস্টিংসের শঠতাপূর্ণ আচরণ বৃটিশ শাসনের কুশ্রীতাই প্রকট করে তুলেছে । লেখকের সমকালে ইংরাজ শাসনের বিরুদ্ধে দেশে যে অসন্তোষ ধূমায়িত হতে থাকে তারই ইন্ধন সৃষ্টিতে সহায়ক হয়েছে এই উপন্যাস গুলি ।

মনোরম বসাক, মদন দত্ত, ছিদাম বিশ্বাস, কৃষ্ণানন্দ বাবাজী ইত্যাদি বিভিন্ন পরিবেশের বৈচিত্র্য পূর্ণ মানসিকতার অধিকারী পুরুষ চরিত্রের সঙ্গে আমরা এখানে পরিচিত হই। দেশের সংকটপূর্ণ রাজনৈতিক পরিস্থিতি সাধারণ জন জীবনে যে করাল গ্রাস বিস্তার করে এবং চরম অবিশ্বাস ও অনাস্থার পরিস্থিতি ব্যক্তি চরিত্রকে কিভাবে বিড়ম্বিত করে তার বেদনাদায়ক চিত্র উপন্যাসে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে।

হেস্টিংসের দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ এবং তার সমস্ত অন্যায় মূলক কাজে প্রধান সহায়ক ইজারাদার দেবী সিংহের চরিত্র গ্রামবাংলার চিরন্তন উৎপীড়ক পুরুষ চরিত্র হিসাবেই উপস্থাপিত হয়েছে। ইতিহাসে কুখ্যাত অত্যাচারী দেবী সিংহের বিভীষিকাময় পরিচয়ের ইঙ্গিত বঙ্কিমের 'দেবী চৌধুরাণী' উপন্যাসে ব্রজেশ্বরের পিতার জমিদারী নিয়ে সংকট কালে পাওয়া গেছে।

হেস্টিংসের সীমাহীন অর্থলিপ্সা দেওয়ান ও ইজারাদারদের রাজস্ব আদায়ে অমানুষিক অত্যাচারের পথে কিভাবে উৎসাহিত করে এদেশকে হতশ্রী করে তুলেছিল তারই আর এক নিদর্শন ' অযোধ্যার বেগম' উপন্যাস। এদেশে বণিকের মানদণ্ডকে রাজদণ্ডে পরিণত করবার জন্য ইংরেজ যে নীচপ্রতারণা ও শঠতার পথ অবলম্বন করেছিল এই উপন্যাসে সেই প্রতারক ও প্রবঞ্চক চরিত্রই প্রকাশিত হয়েছে। নির্মম নিপীড়ক কর্নেল হ্যানে সাহেবকে লেখক 'নরপিশাচ' 'রাক্ষস প্রকৃতি' প্রভৃতি বিশেষণে ভূষিত করে তাদের জঘন্য চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ফুটিয়ে তুলেছেন। অর্থলোভে রাজ পরিবারের মহিলাদের উপর অমানুষিক অত্যাচার সেদিনের শাসক পুরুষকে 'বর্বর' অভিধায় অভিহিত করার পথ প্রশস্ত করেছে।

ইংরাজ রাজত্বের সূচনা থেকেই এদেশবাসীর উপর নির্দয় ব্যবহার যে অসন্তোষ জনমানসে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে

সিপাহী বিদ্রোহে তার বিস্ফুখ প্রকাশ । এই বিদ্রোহ অবলম্বনে বঙ্কিমযুগে বহু উপন্যাস রচিত হয় । এই বিদ্রোহের অন্যতম উৎসাহদাত্রী ঝান্সীর রাণীর চরিত্র অবলম্বনে উপন্যাস রচনা করে লেখক জাতীয় আন্দোলনের পটভূমিকায় ইংরাজ বিরোধী মনোভাব এর পরিচয় দিয়েছেন । রাণী লক্ষ্মীবাঈ এর মুখে ইংরাজ সম্পর্কিত মনোভাবে তাদের 'সন্দিগ্ধ চিত্ত ও স্বার্থপর জাতি' রূপে অভিহিত করে লেখক এই বিদেশী চরিত্রের প্রতি তৎকালীন জন মানসের বিরূপ মনোভাব ফুটিয়ে তুলেছেন ।

ঊনবিংশ শতকের স্বদেশ ভাবনার ফলশ্রুতি , একদিকে এই অজস্র ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনা , অপর দিকে সমাজ জীবনের অনগ্রসরতার জন্য সমাজ সংস্কারের চিন্তায় সমাজ সমস্যা মূলক উপন্যাস লেখার প্রবণতা ।

সর্বদেশে সর্বকালেই সমাজ নানা সমস্যার চাপে বিব্রত থাকে । এক সমস্যার সমাধান নতুনতর অপর সমস্যার সৃষ্টি করে । সমাজবদ্ধ মানুষ তাই চিরদিনই সমস্যার ভারে জর্জরিত । যুগে যুগে সমস্যার রূপ পরিবর্তন হয় মাত্র , কিন্তু সমস্যা পীড়িত পুরুষ চরিত্র সব যুগেই দেখা যায় ।

বঙ্কিম যুগে যে সমস্যাগুলি সামাজিক অগ্রগতিকে ব্যাহত করে রেখেছিল সেগুলি হচ্ছে বাল্য বিবাহ , পুরুষের বহুবিবাহ, [redacted] বাল্যবিধবা , কৌলীন্যপ্রথা , জাতিভেদ , পণপ্রথা ইত্যাদি।ব্রাহ্ম ধর্মান্দোলন , স্ত্রী শিক্ষা , বিদেশী শিক্ষার প্রভাব , যৌথ পরিবারের ভাঙন , পল্লী জীবন কেন্দ্রিক দারিদ্র্য , শিক্ষিত পুরুষের বেকারত্ব বিধবা বিবাহ ইত্যাদি সমস্যাগুলি নতুন শিক্ষা ও ভাবধারার সংস্পর্শে সৃষ্ট হয়েছিল । এই সব সামাজিক সমস্যায় জর্জরিত পুরুষ চরিত্র একালের সামাজিক পারিবারিক উপন্যাসে চিত্রিত হয়েছে । জীবন সমস্যার ব্যাপক বিস্তৃতি ও পরিবেশের বিভিন্নতা একালের পুরুষ চরিত্রগুলিকে বৈচিত্র্যপূর্ণ করে তুলেছে ।

বাল্যবিবাহ, পণপ্রথা, কৌলীন্যপ্রথা, পুরুষের বহু বিবাহ এদেশে দীর্ঘদিন ধরে অনুষ্ঠিত হয়ে চলেছিল। এরই ফলশ্রুতি সমাজে অসংখ্য বালবিধবার সৃষ্টি। সংস্কার পীড়িত, পুরুষ শাসিত সমাজে এই ভাগ্যবঞ্চিত অসহায় নারীকুলের অশ্রুজল মোচনের কোন ব্যবস্থা ছিল না। অবরোধ প্রথা, শিক্ষার অব্যবস্থা সেদিন এই নারীদের সামনে কোন অবলম্বন বা আশার আলো দেখায়নি। ফলে এরা পিতৃগৃহে বা শ্বশুরালয়ে অথবা নিকট আত্মীয়দের কাছে বোঝা স্বরূপ হয়ে বিড়ম্বিত জীবন কাটাতে বাধ্য হোত। সমাজের কাছ থেকে কলঙ্ক ছাড়া আর কিছু এদের ভাগ্যে জোটেনি। পুরুষ প্রধান সমাজে সামাজিকবিধি পুরুষের বহু বিবাহের ও নানা ব্যভিচারের পথ উন্মুক্ত করে রেখেছিল কিন্তু নারীর ক্ষেত্রে স্বামী ব্যতীত অপর কোন পুরুষের চিন্তা হৃদয়ে স্থান পাওয়াও মহাপাপ রূপে গণ্য হোত। ক্রমে নারীদরদী মুষ্টিমেয় সমাজ সংস্কারকগণ বিধবা দের সামাজিক সমস্যা নিয়ে চিন্তা সুরু করেন। সমসাময়িক সংবাদপত্রে বিধবা বিবাহ নিয়ে নানা প্রশ্ন আলোচিত হয়, এর সুপক্ষে ও বিপক্ষে বহু অভিমত প্রকাশ পায়। রক্ষণশীল হিন্দু সমাজের অধিকাংশই বিধবা বিবাহের বৈধতা নিয়ে নানা বিতর্ক সুরু করেছিলেন। অবশেষে এই হিন্দু সমাজেরই বর্ণশ্রেষ্ঠ পরিবারের এক অসাধারণ পন্ডিত ব্যক্তির প্রচেষ্টায় বিধবা বিবাহ আইনতঃ স্বীকৃত ও সমর্থিত হয় ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে। কিন্তু আইন সম্মত হলেও সমাজ মন দীর্ঘদিন যাবৎ বিধবা বিবাহ বিধিকে সাদরে বরণ করে নিতে পারেনি। সামাজিক প্রতিবন্ধকতা বিদূরিত হলেও সংস্কার পীড়িত নারীমন যেন আজও এ ব্যাপারে কুণ্ঠিত বোধ করে। [৬] বিধবা বিবাহ সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্র রক্ষণশীল মানসিকতার অধিকারী ছিলেন বলা যায়। সাম্য প্রবন্ধে তিনি বলেছেন,

---

৬। 'এখন কেউ বলেন না ও বিধবা বে করেছে'।— ১২ই জানুয়ারী - ১৯৭৭, আনন্দবাজার পত্রিকা।

" বিধবা বিবাহ ভালও নহে মন্দও নহে , সকল বিধবার বিবাহ হওয়া কদাচ ভাল নহে , তবে বিধবাগণের ইচ্ছামত বিবাহে অধিকার থাকা ভাল । যে স্ত্রী স্বামী , পূর্বপতিকে আন্তরিক ভালবাসিয়াছিল , সে কখনই পুনর্বার পরিণয় করিতে ইচ্ছা করে না , যে জাতিগণের মধ্যে বিধবা - বিবাহ প্রচলিত আছে সে সকল জাতির মধ্যেও পবিত্র স্বভাব বিশিষ্টা স্নেহময়ী সাধ্বীগণ বিধবা হইলে কদাপি আর বিবাহ করেনা ।" [৭]

উদ্ধৃতিটির শেষাংশে বঙ্কিমের যে রক্ষণশীল মনোভাবের পরিচয় প্রচ্ছিন্ন রয়েছে তাঁর উপন্যাসে এই ভাবেরই সমর্থন পাওয়া যায় । বিধবাদের স্বীয় অভিলাষ অনুযায়ী বিবাহের অধিকারকে উল্লিখিত উক্তিতে স্বীকৃতি জানালেও তিনি তাঁর 'মৃণালিনী' উপন্যাসের নায়ক হেমচন্দ্রকে দিয়ে এর বিপরীত মনোভাব সম্পন্ন উক্তিই প্রকাশ করিয়েছেন । মনোরমাকে বিধবা জেনে হেমচন্দ্র বলেছে —

" তুমি বিধবা , যদি স্বামী ভিন্ন অপরকে মনেও ভাব , তবে তুমি ইহলোকে পরলোকে স্ত্রী জাতির অধম হইয়া থাকিবে । অতএব সাবধান হও ।" [৮]

এখানে দেখা যাচ্ছে , বঙ্কিমের পুরুষ বিধবার প্রণয়কে নীতির শাসনে সংযত করতে উন্মুখ । 'বিষবৃক্ষে'র নগেন্দ্রনাথ বিধবা কুন্দনন্দিনীকে বিবাহ করেছিল নারীরূপ মুগ্ধতার বশবর্তী হয়ে । পরানুগৃহীত বিধবার বঞ্চিত

৭। বঙ্কিম রচনাবলী (দ্বিতীয় খণ্ড) — বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
(সাহিত্য সংসদ প্রকাশিত) ... পৃঃ ৪০১

৮। বঙ্কিম রচনাবলী (প্রথম খণ্ড) — বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
(সাহিত্য সংসদ প্রকাশিত) ... পৃঃ ২৩১

জীবনের প্রতি কোন সহানুভূতি বা বিধবা বিবাহের জন্য কোন উদার্য সেখানে ছিল না। বরং পুরুষের বহুবিবাহ তৎকালীন সমাজে প্রচলিত থাকা সত্ত্বেও সে বিধবা কুন্দনন্দিনীকে বিবাহ করায় প্রথমা স্ত্রী, পতিপরায়ণা সূর্যমুখীর প্রতি অবিচার করার জন্য নিজেকে দোষী মনে করে। আবার গোবিন্দলালের ক্ষেত্রে দেখা গেল পারিবারিক মর্যাদার প্রশ্নে জমিদার কৃষ্ণকান্ত রায়ের ভ্রাতুষ্পুত্র তার রক্ষণশীল মানসিকতার চাপে বিধবা রোহিণীর রূপে আকৃষ্ট হলেও তাকে বিবাহিত স্ত্রীর মর্যাদা দিতে পারেনি। 'বাবু' সমাজের উত্তরসূরী হিসাবেই সে সাধ্বী স্ত্রীকে পরিত্যাগ করে রোহিণীর সঙ্গে প্রমাদপুরে অবৈধ জীবন যাপন করেছে।

সেকালের রক্ষণশীল হিন্দুসমাজ বিধবার পুনরায় বিবাহে সম্মতি না দিলেও ব্রাহ্মমতাবলম্বীগণ তাদের প্রগতিশীল মানসিকতায় বিধবার জীবনের সমস্যার প্রতি সহানুভূতিশীল এবং বিধবা বিবাহকে সমর্থন করেছিলেন। বঙ্কিম যুগের বহু উপন্যাসে আমরা বিধবা বিবাহের সমর্থনকারী এ জাতীয় পুরুষ চরিত্রের সাক্ষাৎ পাই।

এ যুগের অন্যতম বিখ্যাত লেখক দেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরীর 'বিরাজ মোহন' উপন্যাসের (১৮৭৮) পূর্ণচন্দ্র বিধবা বিবাহের সমর্থক ব্রাহ্ম যুবক। বিধবা বিনোদিনীর প্রতি তাঁর আসক্তি কুন্দের প্রতি নগেন্দ্রনাথের মত কেবল রূপমুগ্ধতায় বিভ্রান্তকারী নয়, বরং তাঁর উক্তি বিধবাদের প্রতি সহানুভূতি সূচক —

" আজ যদি দেশ মধ্যে বিধবা বিবাহ প্রচলিত হইত তাহা হইলে বিরাজ মোহনের কষ্ট ছিল কি, আর বিনোর মুখই বা মলিন

হইবে কেন ?" [১] পূর্ণচন্দ্রের এই আত্মকথন বঙ্কিম যুগে তাকে বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বকতায় চিহ্নিত করেছে। বালবিধবাদের বঞ্চিত জীবনের দুঃখে কাতর পূর্ণচন্দ্র আরও বলেন –

" আজ অল্পবয়স্কা বিধবাদিগের আর্তনাদে মেদিনী কম্পিত, আজ ধরাতল শোকার্ত, আজ বঙ্গদেশ পাপস্রোতে প্লাবিত, আজ যদি আমরা ইহাঁদিগের দুঃখ দূর করিতে চেষ্টা না করি, তবে অবশ্যই ঈশ্বরের নিকট দোষী হইব।" [১০]

ভাবাবেগের প্রবল্য থাকলেও পূর্ণচন্দ্রের উল্লিখিত উক্তি নব্যশিক্ষিত যুবকের সামাজিক সমস্যা সম্বন্ধে সচেতনতার পরিচায়ক। যে সচেতনতা আমরা ঐ একই সময়ে প্রকাশিত বঙ্কিমের 'কৃষ্ণকান্তের উইলে'র নায়ক গোবিন্দলালের চরিত্রে পাই না।

তৎকালে বালবিধবাদের বিড়ম্বিত জীবন সমাজে কিভাবে সমস্যা সৃষ্টি করত তার পরিচয় এই উপন্যাসেই বিরাজমোহনের জননীর জীবন দিয়ে দেখানো হয়েছে। দশ বৎসরের বিধবা সৌদামিনী বলীনাথ চক্রবর্তীর লালসার শিকার হয়ে অবৈধ গর্ভবতী হয়েছিল এবং সামাজিক কলংক দূর করবার জন্য পুত্র জন্মের পর জলে ভাসিয়ে দিয়ে নিজেও জলে ঝাঁপ দিয়ে কলঙ্কিত জীবনের সমাপ্তি ঘটাতে উদ্যোগী হয়েছিল। ঘটনাচক্রে ঐ পরিত্যক্ত শিশুই সুরম্য গ্রামের ধনী ব্যক্তি কৃষ্ণকান্ত সরকারের পোষ্যপুত্র বিরাজ মোহন।

১। বিরাজ মোহন – দেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী ... পৃঃ ৬১
১০। ঐ ঐ ... পৃঃ ৬৪

বাল বিধবা বিনোদিনী ঐ সরকার বংশেরই কন্যা। পূর্ণচন্দ্র ঘোষের সঙ্গে তার প্রণয় সামাজিক সংস্কারের বিধি নিষেধ পরিণয়ে পরিণতি লাভ করতে পারেনি। ব্রাহ্মসমাজবলম্বী পূর্ণচন্দ্র সমাজকে উপেক্ষা করেই বিধবা বিবাহে অগ্রণী হয়েছিলেন কিন্তু বিরোধী চক্রান্তকারীদের ষড়যন্ত্রে এই দুটি প্রণয়ীর মিলনে বাধা দেখা দেয়। বিনোদিনীকে জোর করে অন্যত্র বিবাহ দেওয়া হয়েছিল।

পূর্ণচন্দ্র ও বিনোদিনীর বিবাহ সংঘটিত না হলেও সমাজের বিরোধিতা করার যত মানসিকতা পূর্ণচন্দ্রকে সমাজবন্ধন উপেক্ষাকারী আধুনিক ব্যক্তিত্বের পরিচয়ে চিহ্নিত করেছে। বিনোদিনীর প্রতি তার আসক্তি কেবল মাত্র বৃথতৃষ্ণা জাগিয়ে ভোগলালসা চরিতার্থ করার জন্য তাকে প্ররোচিত করেনি। এই প্রণয়াসক্তিকে কোন অবিনয়ের স্পর্শে সে কলুষিত করতে ইচ্ছুক নয়। বিনোদিনীর ভ্রাতা বিরাজমোহনকে সে গভীর আবেগের সঙ্গে জানায় –

" আমি বিনোদিনীর মন পাইয়াছি, বিনোদিনী একদিন আমার হইবে, আমি নিশ্চয় বিনোদিনীকে উদ্ধার করিবার জন্য সমাজ বন্ধন ছিন্ন করিব। অথবা সমাজের যেখানে যে সকল সংস্কার আবশ্যক তাহা নিশ্চয় করিব, সমাজ আমাকে গ্রহণ করে ভালই, না করিলে আর এক সমাজ প্রবেশ করিব।" [১১]

ঊনবিংশ শতকের ব্রাহ্মসমাজবলম্বীগণ সেদিন সমাজের যে বিভিন্ন সমস্যার সংস্কারে উদ্যোগী হয়েছিলেন, ভাগ্যবঞ্চিতা নারীদের সামাজিক মর্যাদাদানের জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থাবলম্বন তার অন্যতম। পূর্ণচন্দ্র

১১। বিরাজ মোহন – দেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী .... পৃঃ ৩৭

এই উপন্যাসে সেই নারীদরদী আন্দোলনকারীদের অন্যতম পুরুষ রূপে উপস্থাপিত হয়েছে।

সে সময়ের রক্ষণশীল সমাজেও যে অনেক ক্ষেত্রে বাল বিধবা কন্যার অভিভাবকরা পুনরায় কন্যার বিবাহ দিতে আগ্রহী ছিলেন পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'শৈশব সহচরী' (১৮৭৮) উপন্যাসে তার পরিচয় রয়েছে। এখানে বিধবা কুমুদিনীর সঙ্গে রজনীকান্তের বিবাহ দেবার জন্য কুমুদিনীর পিতাই উদ্যোগী হয়েছিলেন।

খগেন্দ্র লাল রায়ের 'শ্রী' (১৮৯৩) উপন্যাসেও বিধবা বিবাহের সমর্থনকারী পুরুষ চরিত্রের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। বিধবা ভগিনীর পুনর্বিবাহ দেবার জন্য সীতা দেবীর স্বামী অখিলবাবু উৎসাহী হন। তাঁর অভিমত —

" ধর্ম্ম যখন আমার পক্ষে, শাস্ত্র যখন আমার প্রতি-পোষক তখন কেবল ভগ্ন সমাজের বিভীষিকায় আমার ভগ্নীকে চিরদিন কাঁদাইতে পারিব না। " [১২]

বিধবা সীতাকে পুনর্বিবাহে গ্রহণ করতে অভিলাষী জীবন বাবুও সামাজিক কুসংস্কার ও দেশাচার লঙ্ঘন করে বিধবা বিবাহ অনুষ্ঠানে হৃদয়বৃত্তিকে সামাজিক সংস্কারের উর্ধ্বে স্থান দিয়েছেন। যদিও বিবাহ অন্যত্র গিয়ে করতে হয়েছে।

বিধবা বিবাহ সংঘটিত হলেও বিধবা বিবাহ জাত

১২। শ্রী — খগেন্দ্রলাল রায় .... পৃঃ ৪২

সন্তান যে সমাজের চোখে সমস্যা রূপে গণ্য হতে পারে এই আশংকায় অনেকে বিব্রত বোধ করেছেন। যেমন, 'শ্রী' উপন্যাসেরই সীতা - জীবনের কন্যা শ্রী শৈশবে মাতৃহীনা হলে তাকে নিয়ে পিতা জীবনের দুর্ভাবনা "সংসার ত্যাগ করিতে ত কৃতসংকল্প করিয়াছি, কিন্তু শ্রীর ব্যবস্থা কি করিব? তাহাকে কাহার হস্তে সমর্পণ করি? মাতুলালয়ে তাহাকে পাঠাইব না। সমাজ ভয়ে ও সংস্কার গুণে শ্বশুর মহাশয় তাহাকে লইতেও অনিচ্ছুক হইতে পারেন"।[১৩]

বিধবা বিবাহ রমেশচন্দ্র দত্তের 'সংসার' উপন্যাসেও (১৮৮৬) সংঘটিত হয়েছে শরৎ ও সুধার মধ্যে। সেখানে কিন্তু শরৎ কে গ্রামবাসীরা একঘরে করবার জন্য উদ্যোগী হলেও অবশেষে ধনী তারিণী বাবুর প্রভাবে ও শরতের মাতার ব্রাহ্মণ ভোজনের ব্যবস্থায় এবং সর্বোপরি এই দম্পতির মধুর ব্যবহারে গ্রামবাসীরা এদের সঙ্গে বিরোধিতার চেষ্টা করেনি। সুধা ও শরতের বিবাহে অবশ্য তাদের তালপুকুর গ্রাম ও নিকটবর্তী অঞ্চলের সমাজপতিরা স্বীকৃতি জানাতে সম্মত হয়নি। তাঁদের মতে বিধবা বিবাহ প্রথা ব্যভিচার মাত্র। কিন্তু সমাজপতিদের বিধান অগ্রাহ্য করেও শরৎ - সুধা সুখে কলকাতায় বাস করে। নতুন যুগের পুরুষের পক্ষে সমাজপতিদের বিধি - বিধান অগ্রাহ্য করেও যে সুখে জীবন নির্বাহ করা সম্ভব তা রমেশচন্দ্রের 'সংসার' উপন্যাসে প্রকাশিত হয়েছে। ব্যক্তির হৃদয়বৃত্তির ওপর সমাজের বিধি বিধানের শাসন যে ক্রমে পরাভূত হতে চলেছে উপন্যাসে হেম ও শরতের চরিত্রে তারই সমর্থন পাওয়া যায়। তাই শরৎ - সুধার পুত্রকে নিয়ে 'শ্রী' উপন্যাসের জীবনের মতো কোন দুর্ভাবনার কারণ ঘটেনি।

১৩। শ্রী – খগেন্দ্রলাল রায় .... পৃঃ ৫৬

বিধবা বিবাহে উদ্যোগী আর এক পুরুষ চরিত্র অরকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'অদৃষ্ট' (১৮৯২) উপন্যাসের নায়ক যদু । অবশ্য প্রত্যক্ষদর্শী সুলোচনার সঙ্গে তার বিবাহ ব্রাহ্মমতে সম্পন্ন হয় । শিবনাথ শাস্ত্রীর 'যেমন বউ' (১৮৭১) উপন্যাসে বিধবা বিবাহ সংঘটিত না হলেও বিধবা বামার সঙ্গে হরিতারণের প্রণয় এবং তাতে অভিভাবকদের প্রচ্ছন্ন সমর্থনের চিত্র পাওয়া যায় । 'যুগান্তর' উপন্যাসে (১৮৯৫) লেখক শিবনাথ শাস্ত্রী নবীনচন্দ্রের সঙ্গে কৃষ্ণ কামিনীর বিবাহ ঘটিয়েছেন । দামোদর মুখোপাধ্যায়ের 'বিমলা' (১৮৮৭) উপন্যাসে নরেন্দ্রও বিধবা মনোরমার প্রতি প্রণয়কে পরিণয়ে পরিণত করেছে বলে বর্ণিত হয়েছে ।

এভাবে দেখা যায় , বঙ্কিমযুগের অনেক ঔপন্যাসিকই বিধবার প্রণয়ী বা বিধবা বিবাহে আগ্রহী পুরুষের চরিত্র অবলম্বনে উপন্যাস রচনা করেছেন । বিধবার প্রতি আসক্তি বা বিধবার প্রণয়কে বঙ্কিম যেভাবে বক্রদৃষ্টিতে দেখেছেন, তাঁর নীতিবাদী মানসিকতায় 'বিষবৃক্ষ' ও 'কৃষ্ণকান্তের উইলে' পুরুষের জীবনে বিধবার প্রতি আসক্তিকে নারীরূপ মুখতার সর্বনাশ পরিণতির চিত্ররূপে অঙ্কিত করেছেন , এ যুগের অন্য ঔপন্যাসিকের সে পথ অবলম্বন করেননি । তাঁদের ক্ষেত্রে , বিধবার প্রতি পুরুষের আসক্তি স্বাভাবিক হৃদয়াবেগের প্রাবল্যের ফল , বিধবা বিবাহের পরিণতিও সর্বদা পুরুষের জীবনে বিপর্যয় সৃষ্টি করেনা । বরং বিধবার প্রতি প্রণয় ও বিবাহ পুরুষের জীবনকে সুখী করে এমন দৃষ্টান্তও পাওয়া যায় ।

উল্লেখযোগ্য বিষয় হচ্ছে , বঙ্কিমের নগেন্দ্রনাথ বা গোবিন্দলালের মত অর্থ ও পারিবারিক মর্যাদার প্রতিপত্তি এ যুগের উপন্যাসে বিধবা বিবাহে উদ্যোগী পুরুষদের অনেকেরই ছিল না । জমিদার নগেন্দ্রনাথ বা জমিদারের ভ্রাতুষ্পুত্র গোবিন্দলালের পক্ষে সমাজবিধিকে লঙ্ঘন করার সাহস যতটা সহজ ছিল সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারের শরৎচন্দ্র, পূর্ণচন্দ্র, জীবন,

নরেন্দ্র প্রভৃতির পক্ষে ততটা ছিল না । তবুও এরা প্রচলিত সমাজ সংস্কারের বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত হৃদয়াবেগের প্রাধান্য স্থাপনে অগ্রণী হয়ে, আধুনিকতার বার্তা বহনকারী রূপে উপস্থাপিত হয়েছে । পরবর্তীকালে বিভিন্ন উপন্যাসে পুরুষ চরিত্রে বিধবা বিবাহ সম্পর্কিত বলিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গীর আরও বিস্তার ঘটেছে যা কল্লোলযুগে ব্যাপক পরিণতির মধ্য দিয়ে বর্তমান কাল পর্যন্ত প্রসারিত হয়েছে ।

পণপ্রথা , কৌলীন্য প্রথার সঙ্গে বাল্য ও বহুবিবাহ প্রথার ঘনিষ্ঠ সংযোগে সে কালের সমাজে অসংখ্য দুর্নীতির সৃষ্টি হয়েছিল । বিদেশী শিক্ষার প্রভাবে ও অর্থনৈতিক সমস্যার চাপে এই কুপ্রথাগুলি অবলোপের অভিমুখী হয় । কিন্তু পণপ্রথা আজও কন্যাদায়গ্রস্ত পিতার কাছে বিভীষিকা , যদিও সরকারী বিধি এর বিপক্ষে । বঙ্কিম যুগের উপন্যাসে ঐ হীনপ্রথা গুলির প্রভাবে পুরুষ চরিত্র কিভাবে চিত্রিত হয়েছে তার পরিচয় নিতে গেলে বহু বিচিত্র মানসিকতার অধিকারী পুরুষের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় ।

বঙ্কিমের 'দেবী - চৌধুরাণী' (১৮৮৪) উপন্যাসের নায়ক ব্রজেশ্বর তিনটি বিবাহ করেছিল । সৌন্দর্যের খাতিরে দরিদ্র বিধবার কন্যা প্রফুল্ল জমিদার হরবল্লভের পুত্রবধূ হয়েছিল কিন্তু ঈর্ষা পরায়ণ প্রতিবাসী কন্যাযাত্রীদের মিথ্যা অপবাদে বিধবা মাতা কুলটা ও জাতি ভ্রষ্টা হিসাবে হরবল্লভের কাছে প্রচারিত হওয়ায় হতভাগিনী প্রফুল্ল শ্বশুরালয় থেকে পরিত্যাজ্য হয়েছিল এবং সেকালের সমাজবিধি অনুযায়ী , সামন্ততান্ত্রিক মানসিকতার অধিকারী , পিতৃ অনুগত পুত্র ব্রজেশ্বর বিবাহিতা স্ত্রীর প্রতি কোন দায়িত্ব প্রতি-পালন না করে অন্যত্র বিবাহ করেছিল । স্ত্রীর প্রতি কর্তব্য পালনে পরাঙ্মুখ এ জাতীয় অপর পুরুষ চরিত্র বঙ্কিমের সীতারাম । তাঁরও প্রথমা পত্নী শ্রী প্রিয় প্রাণহন্ত্রী হবে এই দৈব গণনার জন্য স্বামী পরিত্যক্ত হয়েছিল । সামন্ততান্ত্রিক বঙ্গসমাজে এ জাতীয় বহুপত্নীক পুরুষ এবং ভাগ্য দোষে বিনা

অপরাধে স্বামী পরিত্যক্ত অসহায় স্ত্রী সমাজে প্রচুর দেখা যেত । 'দেবী চৌধুরাণী' উপন্যাসে লেখকের রোমান্টিক মনোভাবে ব্রজেশ্বর ও প্রফুল্লের জীবনে যে মিলনান্তক পরিণতির চিত্র দেখানো হয়েছে বাস্তবে তা ছিল বিরলদৃষ্ট ।

পুরুষের বহু বিবাহের সুযোগে বৃদ্ধের তরুণী ভার্যার চিত্র বঙ্কিমের 'রজনী' উপন্যাসে দেখা গেছে ৬৩ বৎসরের বৃদ্ধ রামসদয় দত্তের ১৯ বৎসরের 'ষোল আনা গৃহিনী' লবঙ্গলতা'র ক্ষেত্রে । এখানেও বঙ্কিমের রোমান্স প্রবণতা কোন বিরোধ বা সংঘাতের চিত্র , এক্ষেত্রে যা স্বাভাবিক তা ঘটতে দেয়নি ।

কিন্তু বঙ্কিমযুগের উপন্যাসিকরা কৌলীন্যপ্রথা, বাল্য ও বহু বিবাহের বাস্তব সমস্যার দিকটি তুলে ধরেছেন । সেখানে চরিত্রগুলি আদর্শলোক থেকে বাস্তবতার দিকে পদক্ষেপ করেছে বলা যায় ।

দেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরীর 'যোগজীবন' (১২৮৯) উপন্যাসে দেখা যায় , কুলীন ব্রাহ্মণের সন্তান হরিহর সতেরো বৎসর বয়সে পাঁচটি কন্যার পাণিগ্রহণ করেছে এবং তাদের বয়স ১০ থেকে ৩৮ বৎসরের মধ্যে । হরিহরের পিতা পঞ্চান্ন বৎসর বয়সের মধ্যেই শতাধিক স্ত্রীর স্বামী হয়েছেন এবং চার বৎসরের শিশু কন্যা থেকে ষাট/সত্তর বৎসরের বৃদ্ধা পর্যন্ত হরিহরের মাতার সংখ্যাভুক্ত । এক্ষেত্রে স্বামীর থেকে অধিক বয়স্কা স্ত্রী গ্রহণেও কোন দ্বিধা দেখা যায় না । বিশ শতকের কোন উপন্যাসে এ জাতীয় 'নারীবাহন' পুরুষের চরিত্র আমরা কল্পনাই করতে পারিনা । মনে হয় যেন সেকালের পুরুষেরা নির্বিচারে স্ত্রী'র সংখ্যা বৃদ্ধি করতে কোনরূপ দ্বিধা করতেন না । বিবাহ নামক ব্যাপারটা এদের কাছে ছেলেখেলার মতই সাধারণ বিষয়রূপে বিবেচিত হোত । পণপ্রথা , কৌলীন্য প্রথা ও বাল্যবিবাহের রীতি প্রচলিত থাকায় পুরুষের পক্ষে সেদিন এভাবে নারীর জীবনকে নিয়ে বিবাহের নামে যথেচ্ছাচারিতার সুযোগ ছিল প্রচুর । বহু পত্নীক এই কুলীন

স্বামীরা স্ত্রীকে পিত্রালয়ে রেখে নিজেরা দায়িত্বহীন , অলস , পরমুখাপেক্ষী , আত্মকেন্দ্রিক জীবন যাপনে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিল । কুলীন জামাতাগণ শ্বশুরালয়ে পদার্পন করতেন উপযুক্ত আপ্যায়ন , সমাদর ও অর্থ প্রাপ্তির আশায় । পত্নীর প্রতি কোন কর্ত্তব্য পালনের তাগিদ তাদের মধ্যে ছিল না । 'আলালের ঘরের দুলালে' মতিলালের দিদি প্রমদার স্বামীর ক্ষেত্রে আমরা কুলীন জামাতার দায়িত্বহীনতা ও অর্থলিপ্সার পরিচয় পেয়েছি । বঙ্কিমযুগেও এই ধরণের কুলীন পুরুষের উপস্থাপনা ঘটেছে । শিবনাথ শাস্ত্রীর 'মেজ বউ' উপন্যাসে নদীয়া জেলার অন্তর্গত নিশ্চিন্তপুর গ্রামের নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ মধুসূদন চট্টোপাধ্যায়ের জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্যামা সম্বন্ধে বলা হয়েছে - " বয়ঃক্রম ১৭ কি ১৮ বৎসর , কুলীনের ঘরে পড়িয়াছিল সুতরাং তাহার আর শ্বশুর ঘর করিতে যাইতে হয় না ।" [১৪] বিবাহিতা হয়েও শ্বশুরালয়ে নিজ দাবী ও মর্যাদার আসন লাভ না করে , কদাচিৎ স্বামীদর্শন লাভের সৌভাগ্যটুকু অর্জন করে সেদিন বাংলা দেশের বহু হতভাগিনী কেই পিতৃগৃহে হতশ্বাসে জীবন কাটাতে হয়েছিল । পক্ষান্তরে , কুলীন জামাতাগণ গ্রামে গ্রামে ঘুরে , বিভিন্ন শ্বশুরালয়ে সমাদরের পরিমান যাচাই করে জীবন অতিবাহিত করত । স্ত্রী পুত্রের ভরণ পোষণের দায়িত্ব , স্বাভাবিক সংসার জীবন নির্বাহ ইত্যাদি প্রবণতা এদের মধ্যে ছিল না । অনেক সময় এদের শ্বশুরালয়ের সংখ্যা এত অধিক হোত যে তালিকা মিলিয়ে হিসাব সন্ধান করতে হোত । বিবাহ ব্যাপারটা এই কুলীন পুরুষদের পক্ষে নির্ঝঞ্ঝাট , লাভজনক ব্যবসায় রূপে পরিগণিত হয়েছিল বলা হয়ত অসংগত হবে না । রামনারায়ণ তর্করত্নের ' কুলীন কুল সর্ব্বস্ব ' নাটকে এই কৌলীন্য প্রথার চিত্রই তুলে ধরা হয়েছিল ।

পুরুষের এই যথেচ্ছাচারিতার সুযোগে অনেক ক্ষেত্রে

১৪। শিবনাথ রচনা সংগ্রহ (প্রথম খন্ড) — শিবনাথ শাস্ত্রী (আদিব্রাহ্ম প্রকাশন, পশ্চিমবঙ্গ নিরক্ষরতা দূরীকরণ সমিতি) .. পৃঃ ২

স্বামী সুখবঞ্চিতা , পিত্রালয়ে অবস্থানকারী কুলীন বধূগণ অপরিতৃপ্ত কামনা পরিপূর্তির জন্য ব্যভিচারের পথে পদক্ষেপ করত । যথেচ্ছাচারী পুরুষের পক্ষে এর প্রতিবিধান সম্ভব ছিল না । প্রাক্ বঙ্কিম যুগে 'নববাবু' র জীবনে এই সমস্যার চিত্র পাওয়া গেছে । বঙ্কিমযুগে দেবী প্রসন্ন রায়চৌধুরীর 'যোগজীবন' (১২৮৪) উপন্যাসের নায়ক হরিহরের জীবনের সমস্যা আরও মর্মান্তিক । তার অন্যতম কলঙ্কিনী স্ত্রী জানদা পিতা ও ভ্রাতাদের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে স্বামী হরিহরকে হত্যা করার উদ্যোগী হয় । অবশ্য হরিহরের অপর পত্নী জানদার সহোদরা সুশীলা স্বামীকে গোপনে পালিয়ে গিয়ে আত্মরক্ষা করতে সাহায্য করে ।

এই নব্যশিক্ষিত হরিহর কিন্তু পরে বহু বিবাহের কুফল সম্বন্ধে সচেতন হয়ে কৃতকর্মের জন্য গ্লানি অনুভব করে । নতুন শিক্ষার সঙ্গে পরিচয় পুরুষের বহুবিবাহে বিরূপ মনোভাব সৃষ্টিতে সহায়ক হচ্ছে এখানে তার ইঙ্গিত পাওয়া গেল ।

কিন্তু এই হরিহর অপর যে চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দিয়েছে তা অভিনব । স্ত্রী বসন্তকুমারীকে সে শিক্ষিত করার চেষ্টায় বন্ধু জ্ঞানচন্দ্রের হাতে তার শিক্ষার ভার দিয়েছে । বসন্তকুমারী ও জ্ঞানচন্দ্রের মধ্যে প্রণয় জন্মালে হরিহর উভয়কে তিরস্কৃত করে কিন্তু পরিশেষে ঋণের দায়ে মেটাতে অর্থাভাবের জন্য বসন্তকুমারীকে তিন সহস্র টাকার বিনিময়ে জ্ঞানচন্দ্রের হাতে তুলে দেয় । এখানে তার উদারতা অপেক্ষা অর্থ নিপ্সাই প্রধান লাভ করেছে ।

যেখানে হিন্দুনারীর স্বামী সংস্কার অত্যন্ত প্রবল , স্বামী - স্ত্রীর সম্পর্ক জন্ম - জন্মান্তরের বলেই নারী পুরুষের ধারণা ছিল সেই সময় অপরের বিবাহিত স্ত্রীকে পত্নী রূপে গ্রহণ করে জ্ঞানচন্দ্রও উল্লেখযোগ্য

চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দিয়েছে । 'বিবাহ বিচ্ছেদ' বিধি তখনও বহু দূরবর্তী , কিন্তু এই উপন্যাসের চরিত্রগুলি যেন তার আগমনবার্তার ইংগিত বহনকারী ।

সেকালের বিবাহে অর্থ ও বংশ কৌলীন্যের ভূমিকা ছিল প্রধান । নারী পুরুষের হৃদয়গত মিলের ওপর কোন গুরুত্বই দেওয়া যেত না । ফলে অর্থ লোভে উপযুক্ত কুলীন পাত্রে কন্যাদানের জন্য বহু পিতা বা অভিভাবক বৃদ্ধের সংগে বালিকার বিবাহ দিতে ইতস্ততঃ করত না , রমেশ চন্দ্র দত্তের ' সংসার' উপন্যাসে শরৎচন্দ্রের ভগিনী কালীতারার চল্লিশ বৎসরের পাত্রের সংগে বিবাহ এবং পরিণামে হতভাগিনী বালিকার অকাল বৈধব্যের চিত্র তুলে ধরা হয়েছে । 'সমাজ' উপন্যাসে দেখা যায় একমাত্র কন্যার অকালমৃত্যুর শোক সহজেই বিস্মৃত হয়ে বৃদ্ধ অশ্বিনী মল্লিক বংশরক্ষা ও অসুস্থা প্রথমা স্ত্রীর সেবা করার অজুহাতে নবমবর্ষীয়া গোপীকে বিবাহে উদ্যোগী হয়েছেন । বৃদ্ধের এই বালিকা বিবাহের প্রবণতা নগেন্দ্রনাথ গুপ্তের 'লীলা উপন্যাসে দেখানো হয়েছে । প্রথমা স্ত্রীর মৃত্যুর পর গোবিন্দ প্রসাদ বাবু তের বৎসরে আনন্দময়ীকে সাগ্রহে বিবাহ করেন ।

তৎকালীন সামাজিক প্রথা 'গৌরীদানের' পুণ্যার্জন আশায় বহু অভিভাবক সেকালে বালিকা কন্যাকে অযোগ্য পাত্রে বা বৃদ্ধের হস্তে সমর্পণে দ্বিধা করতেন না । এই প্রবণতাকে তীব্র ব্যঙ্গের কশাঘাতে জর্জরিত করা হয়েছে ত্রৈলোক্য নাথ মুখোপাধ্যায়ের 'কঙ্কাবতী' (১৮৯২) উপন্যাসে। শিক্ষিত মানসে এই সামাজিক কুসংস্কারগুলির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সূচিত হওয়ার ইংগিত এই জাতীয় নানা ব্যঙ্গধর্মী উপন্যাসে দেখা যায় । ফলে কৌলীন্য প্রথার অবলোপ এবং বৃদ্ধের বালিকা বিবাহের কাল অবসিত প্রায় বোঝা যায় । পরবর্তীকালের উপন্যাসে এই জাতীয় পুরুষ চরিত্রের সাক্ষাৎ আর বিশেষ পাওয়া যায় না ।

প্রাক্ বঙ্কিম যুগের 'বাবু' চরিত্রের বিবর্তিত রূপ এ যুগের বিবিধ উপন্যাসের পুরুষ চরিত্রে দেখা যায়। রমেশচন্দ্রের 'সমাজ' উপন্যাসে উমা'র স্বামী ধনঞ্জয়, শিবনাথ শাস্ত্রীর 'মেজ বউ' (১৮৮০) উপন্যাসের পরেশচন্দ্র, যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের 'ঠাকুর ঝি' (১৩০১) উপন্যাসের পরেশ, নগেন্দ্রনাথ গুপ্তের 'তপস্বিনী' (১৯০০) উপন্যাসে প্যারী মাধব, গোবিন্দচন্দ্র, হরিচরণ চৌধুরী, খগেন্দ্রলাল রায়ের 'স্ত্রী' (১৮৯৩) উপন্যাসের রামতারক বসু — এরা সকলেই মতিলাল সম্প্রদায়ের উত্তরসূরী। পান - ভোজন, নর্তকীর নৃত্যগীতের প্রতি আসক্তি — বিলাস বৈভবের নিত্য নতুন আয়োজনে এরা জীবনকে তৃপ্ত রাখতে উৎসুক; সুরা ও সুন্দরীর প্রতি পুরুষের চিরন্তন আকর্ষণের চিত্র বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন পরিবেশে উপন্যাসের পৃষ্ঠায় অংকিত হয়েছে এবং মতিলাল গোষ্ঠী যুগে যুগে খোলস পরিত্যাগ করে বিবর্তিত রূপে উপন্যাসে নিজেদের আসন সংরক্ষিত রেখেছে বলা যায়।

বিদেশী শিক্ষার সংস্পর্শে সেদিন অমৃতের পাশাপাশি যে হলাহল উঠেছিল তার প্রভাবে যে কত আদর্শ গুণযুক্ত পুরুষ চরিত্র অধঃপতনের নিম্নতম স্তরে অবতরণ করেছে, কু সংসর্গের প্রভাবে এই সব চরিত্রে সুরাসক্তি ও গণিকালয়ে গমনের প্রবণতা দেখা দেওয়ায় কত সুখের সংসার যে অশান্তির আগুনে ভস্মীভূত হয়েছে তার নিদর্শন রয়েছে বিভিন্ন উপন্যাসে। এখানকার পুরুষেরা তাদের পদস্খলনের জন্য আমাদের বিরাগভাজন হয়না, বরং চরিত্রগত দৌর্বল্যের জন্য তাদের অসহায়ত্ব এবং আত্মরক্ষার ব্যর্থ প্রয়াস আমাদের সহানুভূতি উদ্রেক করে। বঙ্কিমের নগেন্দ্রনাথ ও গোবিন্দলালের কথা এ প্রসঙ্গে মনে পড়ে। যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের 'ঠাকুর ঝি' উপন্যাসের হীরালাল স্ত্রী শরৎ কুমারীর অতিরিক্ত সন্দেহ প্রবণতা ও বন্ধু পরেশের কু পরামর্শে বিপথগামী হয়। নগেন্দ্রনাথ গুপ্তের 'তপস্বিনী' উপন্যাসে সহপাঠী বন্ধু রমানাথের

প্ররোচনায় রজনীকান্ত পণিকা আতরের প্রতি আসক্ত হয়ে স্ত্রী চারুবালার উপর চরম অবিচার করে। পরিশেষে আতর কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হয়ে রজনীকান্ত নিজের ভুল সম্বন্ধে সচেতন হয়। তার পৌরুষের জাগরণ তাকে কুপরামর্শদাত্রী রমানাথের প্রতি বিরূপ করে তোলে প্রবল ক্রোধে তাকে পদাঘাত ও ক্রোধোন্মত্ত অবস্থায় আতরকে হত্যা করা রজনীকান্তের স্বীয় দুর্ভাগ্যের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ গ্রহণ স্পৃহার পরিচায়ক।

বঙ্কিমের গোবিন্দলাল রোহিণীর জন্য সর্বস্ব ত্যাগ করে অবশেষে বিশ্বাস ভঙ্গের অপরাধে তাকে হত্যা করেছিল। এখানেও রজনীকান্ত পতিতা আতরের প্রতি আসক্ত হয়ে তার যথা সর্বস্ব নিঃশেষ করেছিল। আতরের মত পণিকার কাছ থেকে প্রত্যাখ্যাত হওয়া খুবই স্বাভাবিক ঘটনা। সে নিজ মুখেই স্বীকার করেছে, যে পুরুষ যতদিন তাকে অর্থযোগান দিতে পারবে সে ততদিন তার প্রতি অনুরক্ত থাকবে। সুতরাং রজনীকান্ত যখন নিঃস্ব হয়ে তার কাছে এসেছে তখন আতর তাকে পরিত্যাগ করে অর্থপ্রাপ্তি আশায় অন্য পুরুষের সন্ধান সন্ধানে তৎপর। কিন্তু যেহেতু রজনীকান্ত স্বভাব দুর্বৃত্ত নয়, নারীর এই ছলনা সম্বন্ধে সে অনভিজ্ঞ, বিশেষতঃ যে নারীর জন্য সে হৃত সর্বস্ব হয়েছে, বিবাহিতা স্ত্রীর প্রতি নিদারুণ অবিচার করেছে, তার প্রতি বিজাতীয় ক্রোধে সে প্রত্যাখ্যানের অপমানে ক্ষিপ্ত প্রায় হয়ে উঠেছে। অবশেষে সেই ছলনাময়ী নারীকে হত্যা করে প্রতিশোধ স্পৃহা চরিতার্থ করেছে। গোবিন্দলালের পলাতক জীবনের কষ্ট, কারাবাস ইত্যাদি শাস্তির পর লেখক তাকে সন্ন্যাসের পথে ব্রতী করেছেন। কিন্তু রজনীকান্তের ক্ষেত্রে হত্যাপরাধ কারাবাসের পর মৃত্যুদণ্ড তার চারিত্রিক পতনের চরম শাস্তি হিসাবেই নির্দেশিত হয়েছে। লেখক চরিত্রটির সংশোধনের কোন পথ রাখেননি। একালের লেখকদের নীতিবাদী মানসিকতা এভাবে এ যুগের প্রায় সব পুরুষকেই তাদের

অসংযম ও পদস্খলনের জন্য নীতির শাসনে শাস্তি করে উপন্যাসের কাহিনী বিস্তার করেছে ।

বর্তমান কালের কোন পুরুষ প্রকৃত উপার্জনক্ষম হওয়ার আগে বিবাহিত জীবনের দায়িত্ব গ্রহণের কথা চিন্তা করতে পারেনা কিন্তু বঙ্কিম যুগে বাল্য বিবাহের রীতি ও যৌথ পরিবারের নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য বিবাহিত পুরুষের অর্থার্জনের গুরু দায়িত্ব ছিল না । বরং গ্রাম্য বালক বালিকাদের যখন খেলার বয়স অতিক্রান্ত হয়নি সেই সময়েই তাদের বিবাহ সংঘটিত হয়েছে । শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের 'ফুলজানি' (১৮৯৪) উপন্যাসে দেখা যায় গ্রাম্য পাঠশালার পড়ুয়া পঞ্চদশ বর্ষের পুরন্দরের সঙ্গে এগার বৎসরের বালিকা ফুলকুমারীর বিবাহ হয়েছে । বাল্যবিবাহ প্রথা অবলোপের ফলে পরবর্তী কালের উপন্যাসে এমন বালক - বালিকা দম্পতির চিত্র বিশেষ পাওয়া যায় না । পূর্বপুরুষের সম্পত্তি বা পিতার আয়ের ওপর নির্ভরশীলতায় সেকালে পুত্র অনায়াসে বিবাহ কার্যে অগ্রণী হয়েছে । নিজের ও স্ত্রীর ভরণপোষণের জন্য কোন অর্থনৈতিক দুর্ভাবনা নব বিবাহিত পুরুষের মধ্যে ছিল না । শিবনাথ শাস্ত্রীর 'মেজ বউ' উপন্যাসে প্রবোধচন্দ্র , পরেশচন্দ্র , যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের 'প্রেম প্রতিমা' বা 'প্রিয়বেদার (১৮৮৬) ধীরেন্দ্রনাথ , নগেন্দ্রনাথ গুপ্তের 'তপস্বিনী'তে রজনীকান্ত এবং সেকালের অন্যান্য বহু উপন্যাসে পুরুষেরা অধ্যয়নরত অবস্থায় বিবাহ করেছে দেখা যায় ।

যৌথ পরিবারের আশ্রয়ে তখন অনেক পুরুষ স্ত্রী - সন্তানাদি সহ নিজের সংসারের দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন ছিল না । তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'স্বর্ণলতা' (১৮৭৪) উপন্যাসের বিধুভূষণ চরিত্র এই ধরণের দায়িত্বহীন , যৌথ পরিবারে অগ্রজের ওপর নির্ভরশীল পুরুষ চরিত্রের নিদর্শন রূপে গৃহীত হতে পারে । বাল্যে মাতার অত্যাদরে সে পড়াশুনা বেশী করেনি ,

আবার কৌলীন্য প্রথার সুযোগে ও বাল্যবিবাহের সমর্থনে সে অল্প বয়সেই বিবাহ করেছে কিন্তু স্ত্রী - পুত্রের ভরণ - পোষণের জন্য কোন উদ্বেগ তার নেই । লেখক এই চরিত্রটিকে উপলক্ষ্য করে তৎকালীন বাল্যবিবাহ ও কৌলীন্য প্রথাকে কটাক্ষ করে উপন্যাসে লিখেছেন — "

" কিন্তু মূর্খতা বশতঃ কখন কুলীনের বিবাহ বন্ধ থাকেনা । এজন্য ১৫ বৎসর বয়সের মধ্যেই তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল ।" [১৫]

'স্বর্ণলতা' উপন্যাসের প্রথম অংশে পল্লীবাসী মধ্যবিত্ত বাঙালীর যৌথ পরিবারের অন্তর্ভুক্ত চরিত্র ও তাদের সমস্যাবলীর সার্থক রূপায়ণ ঘটেছে । এ সম্বন্ধে রামদুলাল বসুর উক্তি প্রনিধান যোগ্য —

"বাঙালী এতদিন পরে বাংলাদেশের ঘরের কথা ও বাঙালীর প্রাণের কথা পেল উপন্যাসের পাতায় । বাঙালীর যেন আত্মরূপ দর্শন ঘটল ।" [১৬]

বিধুভূষণ মধ্যবিত্ত বাঙালী পুরুষের মানসিকতা নিয়ে উপস্থাপিত । দাদার অন্নে প্রতিপালিত , দায় দায়িত্ববোধ শূন্য এ জাতীয় পুরুষ চরিত্র সেকালের বঙ্গ সমাজে দুর্লভ ছিল না । রবীন্দ্রনাথের গল্পগুচ্ছে , শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে যে পল্লীবাসী মধ্যবিত্ত বাঙালীর সাক্ষাৎ পাওয়া যায় তারকনাথের 'স্বর্ণলতা'য় তার সূচনা বলা যেতে পারে ।

পল্লীকেন্দ্রিক জীবনধারায় মূলতঃ ভূ-সম্পত্তির উপর

১৫। স্বর্ণলতা — তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায় (আশুতোষ ভট্টাচার্য ও সুধীর দে সম্পাদিত) .... পৃঃ ২

১৬। বঙ্কিমচন্দ্রের সমকালীন গৌণ ঔপন্যাসিকবৃন্দ — রামদুলাল বসু .. পৃঃ ২১

নির্ভরশীল যৌথ পরিবার সেকালে বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তির পরামর্শে ও তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হোত। কিন্তু নব্যশিক্ষার ফলে প্রাচীন ও নব্যপন্থীদের মধ্যে মনোমালিন্য, স্বার্থসংঘাত ও ব্যক্তিগত রুচির ভিন্নতায় ক্রমে এই একান্নবর্তী পরিবারের ভিত্তি শিথিল হতে থাকে। কেবলমাত্র ভূ-সম্পত্তির উপর নির্ভরশীল না থেকে নব্যশিক্ষিতরা কলকাতার নাগরিক জীবনে বিভিন্ন চাকুরী সূত্রে অর্থার্জনের চেষ্টায় ব্রতী হলে যৌথ পরিবারে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সংঘাত আরও প্রবল হয়ে ওঠে। প্রথম দিকে পুরুষের শিক্ষা ও চাকুরীর প্রয়োজনে কলকাতায় থাকলেও তাদের পরিজনবর্গ গ্রামের একান্নবর্তী পরিবারেই প্রতিপালিত হয়েছে। সেখানে বয়োজ্যেষ্ঠ অভিভাবকের আদেশ ও নির্দেশ সকলের কাছে সম্মান পালনীয় ছিল। সপ্তাহান্তে শিক্ষার্থী ও চাকুরীজীবী পুরুষের তাদের গ্রামস্থ গৃহে উপস্থিত হয়েছে। বিভিন্ন ছুটি উপলক্ষ্যে পল্লীর বাসগৃহে আসবার জন্য তাদের আগ্রহ দেখা গেছে। ফলে নিত্য পূর্ব্ব পুরুষের বসতবাটী এবং গ্রাম ও গ্রামবাসীদের উপর তাদের আন্তরিক মমতা ও ভালবাসার আকর্ষণ ছিল প্রচুর। পল্লীগ্রামের পরস্পরের সম্প্রীতিতে সুখেই জীবন নির্বাহ হোত। যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের 'প্রেম প্রতিমা বা প্রিয়ংবদা' (১৮৮৬) উপন্যাসের উপেন্দ্রনাথ, রমেশচন্দ্র দত্তের 'সংসার' উপন্যাসের হেমচন্দ্র শরৎচন্দ্র প্রভৃতি পুরুষের কথা এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে।

পল্লীজীবনের ক্রমিক অর্থনৈতিক দুরবস্থা ও নানা অসুবিধা অস্বাচ্ছন্দ্য, ভূসম্পত্তির দুর্গতি, তুলনায় নাগরিক জীবনের বিবিধ সুখ স্বাচ্ছন্দ্য, নিত্য নতুন বিলাস বৈভবের প্রয়োজন, সর্ব্বোপরি ব্যক্তি-স্বাধীনতার উন্মেষ নতুন যুগের পুরুষদের একান্নবর্তী পরিবারের শাসনে পল্লীগ্রামের হতশ্রী জীবন ধারায় আর আকৃষ্ট করে রাখতে পারল না। ফলে সপ্তাহান্তে বা ছুটির দিনে নাগরিক জীবনের সুদ পরিবর্তনের জন্য পল্লীগৃহে উপস্থিতির পরিবর্তে সম্পূর্ণভাবে নাগরিক জীবনধারায় আসক্ত পুরুষের চরিত্র

দেখা দিতে থাকে। এই নাগরিক জীবনাভিমুখী পুরুষেরা আর পল্লীগ্রামের দৈন্যমোচনে আগ্রহী নয়। নিজ পরিবারবর্গকে নিয়ে নাগরিক জীবনের আকর্ষণে এরা গ্রাম ছেড়ে শহরে বসবাস সুরু করে। অর্থের জোরে কেউ শহরে নিজ বাড়ী তৈরী করে কেউ গ্রামের নিজ গৃহ ছেড়ে এসে শহরে ভাড়া বাসায় আশ্রয় নেয়। ফলতঃ পরিবারের সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পেতে থাকে। পূর্ব পুরুষের স্মৃতি বিজড়িত পল্লীগৃহ অনাদরে অবহেলায় ধীরে ধীরে ধ্বংসমুখীন হয়। নাগরিক জীবনে অভ্যস্ত চাকুরীজীবি এই পুরুষ সম্প্রদায় নিজের পরিবারবর্গের সন্তুষ্টি ও যে কোন উপায়ে চাকুরীরক্ষা করে দিনাতিপাত করাটাই জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য বলে মেনে নেয়। চাকুরীজীবি, নাগরিক মধ্যবিত্ত মানসিকতার উদ্ভব এভাবেই হোল বলা যায়।

এই প্রসংগেই বঙ্কিম যুগের উপন্যাসে বিভিন্ন পুরুষ চরিত্রের পেশার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। নতুন শিক্ষাব্যবস্থার সংস্পর্শে আসার ফলে পুরুষের শিক্ষাগত যোগ্যতা ও সেই সংগে বেকার সমস্যার বিষয়ও এই সূত্রে আলোচিত হতে পারে।

প্রথম বঙ্কিম যুগে 'চন্দ্রমুখীর উপাখ্যানে' হেমচন্দ্রের পিতা ভারতচন্দ্রকে উপন্যাসের অন্তর্ভুক্ত চাকুরীজীবি পুরুষ রূপে দেখা গেছে। বঙ্কিমের 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসেও চাকুরীজীবি পুরুষের উল্লেখ রয়েছে। নগেন্দ্রনাথের ভগিনীপতি শ্রীশচন্দ্র মিত্র 'গ্রান্ডলে হেয়ারলি'র বাড়ীর মুৎসুদ্দি ছিলেন। 'ইন্দিরা' তে দেখা যায়, উপেন্দ্রনাথ অর্থোপার্জনের জন্য সুদূর পাঞ্জাবে গিয়েছিলেন এবং 'কমিসেরিয়েটের কর্ম্ম করিয়া অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি' হয়েছিলেন। বঙ্কিমের উপন্যাসে পুরুষের শিক্ষাগত যোগ্যতা সম্বন্ধে কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। তবে প্রত্যেকেই ধনবান। সুতরাং আর্থিক সমস্যায় বিব্রতও কেউ নয়, শ্রীশচন্দ্র ও উপেন্দ্রনাথ প্রচুর সম্পত্তির অধিকারী।

বঙ্কিম যুগের অন্যান্য ঔপন্যাসিকরা চাকুরীজীবি মধ্যবিত্ত বাঙালী পুরুষের বিভিন্ন পেশা ও শিক্ষাগত যোগ্যতার যে চিত্র তাদের রচনায় তুলে ধরেছেন, তাতে দেখা যায়, এরা সকলেই প্রচুর অর্থের অধিপতি নয়। বিশেষতঃ এদেশে শিল্প সম্প্রসারণ তখনও ঘটেনি, ফলে কারখানার মালিক - শ্রমিক সম্পর্কের চিত্র এ যুগের উপন্যাসে অলক্ষিত।

পল্লীবাসীদের জীবিকা মূলতঃ ভূমিনির্ভর ছিল। শহরে শিক্ষার বিস্তৃতি ক্রমে শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা বৃদ্ধি করে চলেছিল। চাকুরী পাওয়ার সমস্যার চিত্র পাই রমেশচন্দ্রের 'মাধব' উপন্যাসে হেমচন্দ্রের ক্ষেত্রে। কলকাতায় কোন চাকুরী পাবার আশায় সে সপরিবারে গ্রাম ছেড়ে দীর্ঘদিন কলকাতায় থাকে এবং বিভিন্ন সূত্রে চাকুরীর সন্ধান করে ব্যর্থ হয়ে অবশেষে তার ভূ-সম্পত্তি নির্ভর জীবনে পল্লীবাস গৃহেই প্রত্যাবর্তন করে। যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের 'প্রেম প্রতিমা বা প্রিয়ংবদা' উপন্যাসের বীরেন্দ্রনাথ চাকুরীর সন্ধানে কলকাতায় এসে বহু ক্লেশ সহ্য করবার পর চাকুরী পেয়েছিল। 'স্বর্ণলতা' উপন্যাসের বিধুভূষণ ও জীবিকার উপায় সন্ধানে কলকাতার দিকে যাত্রা করেছিল। এবং সেখানে গিয়ে যাত্রাদলে বাজনদার হওয়া ছাড়া তার কোন উপায় খুঁজে পায়নি। সেকালে বিধুভূষণের মত স্বল্প শিক্ষিত হতভাগ্যদের জন্য শহরে জীবিকার্জনের পথ বেশী ছিল না।

শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যেও শিক্ষকতা, আইন ব্যবসায়, চিকিৎসা ব্যবসায়, শহরে সওদাগরী অফিসে কাজ করা এবং গ্রামে জমিদারী সেরেস্তায় বিভিন্ন কর্মে নিযুক্ত হওয়া ইত্যাদি নির্দিষ্ট কয়েকটি বৃত্তি বা পেশা ব্যতীত সে যুগে পুরুষের বহুবিধ কর্ম সংস্থানের তেমন কোন সুযোগ ছিল না।

জমিদারী প্রথায় জমিদারের উপর নির্ভরশীল ও অনুগৃহীত যে সব ব্যক্তি বিভিন্ন পেশায় নিযুক্ত থাকতেন তারমধ্যে নায়েবের পদও মর্যাদা ছিল সর্বাধিক। তৎকালীন গ্রামবাংলার এই নায়েবরা কোন

কোন স্থানে জমিদার অপেক্ষা অধিক দাপটে কাজ চালাতেন । অসহায় প্রজাবর্গের উপর এদের নিষ্ঠুর নিপীড়ন ছিল ভয়াবহ আতঙ্কের বিষয় । পরবর্তী কালে শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে এদের চেহারা আরও সুন্দর ভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে । কূটবুদ্ধিতে ও নানা চাতুর্যে এরা অনেক সময় জমিদারের সম্পত্তি বিনষ্ট করার পথ তৈরী করতেন । নিজেরাই আবার সেই সম্পত্তি অধিকার করে সর্বেসর্বা হয়ে উঠতেন । 'মাধবী কঙ্কন' উপন্যাসে নবকুমারের চরিত্রে এই প্রবঞ্চক নায়েবের পরিচয় পাওয়া যায় । প্রখর বৈষয়িক চিন্তা ভাবনায় এরা যথেষ্ট বাস্তব বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছেন । শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের 'ফুলজানি' উপন্যাসের নায়ক পুরন্দরের পিতা মহেশ্বর ঘোষ এই নায়েব চরিত্রের সার্থক প্রতিনিধি —

"ঘোষ মহাশয় মতলব হাঁসিলের জন্য সকল শ্রেণীর লোকের কাছেই প্রস্তুত , মফস্বলের কাছে যখন যেমন তখন তেমন এবং প্রজার কাছে প্রায়ই সিংহ । এ সকলই তাঁর ধর্ম্ম , অর্থ , কাম, মোক্ষ সেই একমাত্র রজতচক্রের জন্য ।" ১৭

দেশে অরাজকতার সুযোগে জমিদার নায়েবেরা অত্যাচার অবিচারে প্রজাদের জীবন কতখানি দুর্বিসহ করে তুলত নবাব সিরাজদ্দৌল্লার আমলের ঘটনা অবলম্বনে লেখা 'ফুলজানি' উপন্যাসে তার পরিচয় আছে । এদের উৎপীড়ন সম্বন্ধে লেখক বলেছেন —

"মুরশিদাবাদের দরবারে দিন দিন যে অভূতপূর্ব্ব অবিচারের অভিনয় হইত , দেশের রাজা - জমিদারগণ আপন আপন আয়ত্তের মধ্যে

১৭। শ্রীশ গ্রন্থাবলী — শ্রীশ চন্দ্র মজুমদার (বসুমতী সাহিত্য মন্দির প্রকাশিত) ... ... পৃঃ ১০২

তাহারই পুনরভিনয় করিতেন , এবং রক্তবীজের রক্তকণার মত পুনঃ পৌণে তাহা সর্বত্র ক্ষুদ্র নবাব শ্রেণী সৃষ্টি করিয়াছিল । এই হিসাবে মনিবের চেয়ে নায়েব , এমন: পাইক পর্যন্ত পদ গৌরবের এক যত নিম্ন , অত্যাচার শক্তি তত বিকশিত হইয়া উঠিত ।" [১৮]

জমিদার প্রজার এই সম্পর্ক পরবর্তীকালে দেশে শিল্প প্রসারণের ফলে কল - কারখানা স্থাপন হওয়ায় শ্রমিক মালিক সম্পর্কে পরিবর্তিত হয়েছে । এই সুযোগ সন্ধানী , কূটকৌশলী , বিষয়বুদ্ধি প্রধান নায়েবরাই শিল্পপতিদের ম্যানেজার রূপে আত্মপ্রকাশ করেছেন একথা বলা হয়ত অসংগত হবে না ।

দেশের পুরাতন প্রথায় টোল - চতুষ্পাঠী কেন্দ্রিক সংস্কৃত অধ্যয়ন নতুন যুগের জীবিকা সংস্থানে আর সহায়ক নয়—এ বিষয়ে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের পিতা ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় যেমন সচেতন হয়ে ইংরাজী পড়া স্থির করেছিলেন তেমনি এ যুগের উপন্যাসের পুরুষেরাও ধীরে ধীরে ইংরাজী শিক্ষার দিকে আগ্রহী হয়ে উঠেছেন দেখা যায় । 'মেঘ বউ' উপন্যাসের মধুসূদন চট্টোপাধ্যায় ও তাঁর বুদ্ধিমত্তার জোরে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন , — " যে দিনকাল আসিতেছে তাহাতে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতী ব্যবসায়ে আর দিন চলিবেনা , ছেলেদিগকে ইংরাজী না শিখাইলে উপায় নাই । এই জন্য তিনি মধ্যমপুত্র প্রবোধ চন্দ্রকে বালকাল হইতেই গ্রামের ইংরাজী স্কুলে দিয়াছিলেন । তিনি তথা হইতে এন্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বৃত্তি পাইয়া কলিকাতায় গিয়া পাঠ করিতেছেন । এ বৎসর তাঁহার বি. এ. পরীক্ষার বৎসর ।" [১৯]

১৮। শ্রীশ গ্রন্থাবলী - শ্রীশ চন্দ্র মজুমদার (বসুমতী সাহিত্য মন্দির প্রকাশিত) ... পৃ ১২৯

১৯। শিবনাথ রচনা সংগ্রহ (প্রথম খণ্ড) — শিবনাথ শাস্ত্রী (সাক্ষরতা প্রকাশন, পশ্চিমবঙ্গ নিরক্ষরতা দূরীকরণ সমিতি) ... পৃ ৩

সুতরাং দেখা যায়, ইংরাজী শিক্ষার প্রতি আগ্রহী হয়ে এ যুগের উপন্যাসের পুরুষের নব্যশিক্ষার সুযোগে বিভিন্ন পেশা অবলম্বনে জীবনযাত্রা নির্বাহের ব্যবস্থা করেছেন।

চিকিৎসকের বৃত্তি গ্রহণকারী পুরুষ চরিত্র হিসাবে কয়েকটি উপন্যাসের চরিত্র উল্লেখ করা যায়। তারকনাথের 'অদৃষ্ট' উপন্যাসের নায়ক যদু এন্ট্রান্স পাশ করে কলকাতার কাছে এক ডাক্তারের অধীনে দশ টাকা বেতনে চাকুরী গ্রহণ করে। পরে সেই কাজ ছেড়ে অন্যত্র সাত টাকা বেতনে দ্বিতীয় কম্পাউণ্ডারের কাজ নেয়। এরও পরে দেখা যায় সে যদুস্থলে নিজেই ডাক্তাররূপে কাজ করে ছয়মাসের মধ্যে দু হাজার টাকা রোজগার করে। মুগ্ধ শিক্ষিত ডাক্তার হলেও যে সেখানে যদুস্থলে প্রভূত অর্থার্জনের সুযোগ ছিল লেখক সেদিকেই যেন ইঙ্গিত করেছেন মনে হয়। পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'মধুমতী' (১২৮০) উপন্যাসের নায়ক করালী চরণও পেশায় ডাক্তার। আর একজন ডাক্তারের উল্লেখ পাওয়া যায় স্বর্ণকুমারী দেবীর 'কাহাকে' (১৮৯৮) উপন্যাসে। এখানে নায়ক ছোট্ট ওরফে বিনয় কুমার বিলাত ফেরত ডাক্তার রূপেই উপস্থাপিত হয়েছে।

শিক্ষকতার পথে ব্রতী পুরুষের পরিচয়ও এ যুগের উপন্যাসে সুলভ। শিবনাথ শাস্ত্রীর 'মেজ বউ' উপন্যাসের নায়ক প্রবোধ চন্দ্র প্রথমে বর্ধমানের এক স্কুলে প্রধানশিক্ষকের কাজ নিয়েছিল। তাঁর পর উপন্যাস 'নয়ন তারা'র (১৮৯১) নায়ক হরেন্দ্র নাথও হুগলী কলেজের শিক্ষক বলেই অভিহিত হয়েছে। এবং 'যুগান্তর' উপন্যাসের নবীনচন্দ্র ফরিদপুর স্কুলে দ্বিতীয় শিক্ষকের কাজ করেছিল বলে উল্লেখ রয়েছে।

আইন ব্যবসায়ে নিযুক্ত পুরুষ চরিত্রের পরিচয়ও কোন কোন উপন্যাসে পাওয়া যায়। 'মেজ বউ' উপন্যাসের নায়ক প্রবোধচন্দ্র

আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে শিক্ষকতার কাজ ছেড়ে ওকালতি আরম্ভ করে প্রভূত অর্থ উপার্জন করেছিল। রমেশ চন্দ্রদত্তের 'সমাজ' উপন্যাসের চন্দ্রনাথ ও আইন ব্যবসায়ী।

ম্যাজিস্ট্রেটের কাজেও যে এ দেশীয় পুরুষরা পারদর্শী তার পরিচয় রয়েছে এই উপন্যাসের নায়ক শরৎচন্দ্রের চরিত্রে। সে কৃতিত্বের সঙ্গে সব পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে মৈমনসিংহের জয়েন্ট ম্যাজিস্ট্রেট নিযুক্ত হয়েছিল।

ইঙ্গ বঙ্গ সমাজের পুরুষরাও এ যুগের উপন্যাসে সুচিত্রিত। শিবনাথ শাস্ত্রীর 'নয়ন তারা' উপন্যাসের ডঃ ম্যান্ডে, বিলাত ফেরত ব্যারিস্টার যোগেশ, স্বর্ণ কুমারী দেবীর 'কাহাকে' উপন্যাসের নবীন ব্যারিস্টার রত্নানাথ ঘোষ, ঐ উপন্যাসের নায়িকা মণিমালার ব্যারিস্টার ভগিনীপতি, প্রভৃতি চরিত্রগুলি এই সমাজের প্রতিনিধি স্থানীয় রূপে গৃহীত হতে পারে। এই বিলাত ফেরত পুরুষ সমাজে বিদেশী কায়দা - কানুন, রীতি - নীতির প্রবল্য, স্বদেশীয় ভাবধারার প্রতি উন্নাসিকত্ব, পাশ্চাত্য ভাবাদর্শে আকৃষ্ট পুরুষ চরিত্রের পরিচায়ক। পরবর্তী যুগের উপন্যাসে যাদের আরও বিশদ পরিচয় পাওয়া যাবে।

ব্রাহ্ম সমাজ ভুক্ত পুরুষেরা ঊনবিংশ শতকে নতুন জীবনধারায় অভ্যস্ত হয়ে শিক্ষায় — রুচিতে — দেশভাবনায় — ধর্মে আভিনবত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন। স্ত্রী শিক্ষা ও স্ত্রী স্বাধীনতার সপক্ষে এদের মতবাদ আধুনিকতার পরিচয়বাহী। শিবনাথ শাস্ত্রী, স্বর্ণকুমারী দেবী প্রমুখ অনেক ঔপন্যাসিকের রচনায় আমরা ব্রাহ্মধর্মাবলম্বী, উদারহৃদয় — আদর্শবাদী পুরুষ চরিত্রের পরিচয় পাই।

'নয়নতারা ' উপন্যাসের নায়িকার পিতা ললিপদ রায় এইরূপ উদারহৃদয় - ধার্ম্মিক - পরোপকারী ব্যক্তি । চরিত্রটি যেন রবীন্দ্র উপন্যাসের সমোর নির্লিপ্ত আদর্শ গৃহী পুরুষের পূর্ব্ব সূরী । পুত্র কন্যাকে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত করা , তাদের সদ্‌বৃত্তিগুলির বিকাশের সহায়তা করা , সন্তানের বিবাহ ব্যাপারে তাদের মতামতের ওপর প্রধান্য দেওয়া , পরমত সহিষ্ণুতা - ইত্যাদি ব্যাপারে ললিপদ রায়ের মনোভাব আমাদের দীর্ঘকাল লালিত পল্লী জীবন কেন্দ্রিক পিতৃ স্থানীয় পুরুষের চিন্তাধারায় নতুনত্ব ও যুগোপযোগী পরিবর্তনের পরিচয় সূচক । বাল্য বিবাহ প্রথার বিপরীত চিত্র আমরা এখানে দেখতে পাই । ২২।২৩ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত অবিবাহিতা কন্যা ব্রাহ্ম সমাজভুক্ত পরিবারে স্বচ্ছন্দে বাইরের পুরুষদের সঙ্গে মেলা মেশা আলাপ আলোচনায় অংশ গ্রহণ করছে এ ব্যবস্থা তৎকালীন রক্ষণশীল হিন্দু পরিবারের অভিভাবক পিতা কখনোই অনুমোদন করতে পারতেন না । কিন্তু শিবনাথ শাস্ত্রীর 'নয়নতারা' , স্বর্ণকুমারী দেবীর 'ছিন্নমুকুল , 'স্নেহলতা', 'বাঙ্গালে' প্রভৃতি উপন্যাসে এ ঘটনা স্বাভাবিক ভাবেই চিত্রিত হয়েছে ।

শিবনাথ শাস্ত্রী ব্যক্তিগত জীবনে গৌড় ব্রাহ্মণ পরিবারের সন্তান হয়েও ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করে হিন্দু সমাজে নানা নিগ্রহ ভোগ করেছিলেন । তাঁর 'যুগান্তর' উপন্যাসে যুবকদের মধ্যে একেশ্বরবাদী ব্রাহ্মধর্ম্ম অবলম্বন , সনাতন রীতিনীতিতে অনাস্থা , পৌত্তলিক হিন্দু ধর্ম্মাচরণের প্রতি অবজ্ঞা , ব্রাহ্মণ সন্তানদের উপবীত ত্যাগ , বিধবা বিবাহের সমর্থন , স্ত্রী শিক্ষা ও স্ত্রী স্বাধীনতার পরিপোষণ ইত্যাদি বিভিন্ন কর্ম্মে উৎসাহ প্রদর্শিত হয়েছে ।

সেকালের হিন্দু সমাজের রক্ষণশীল ও নব্যশিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে যেমন সংঘাত চলেছিল তেমনি আবার হিন্দু ও ব্রাহ্ম সমাজের মধ্যেও চলেছিল নানা ঘাত প্রতিঘাত । ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রকৃত আদর্শ অনুধাবন না করে অনেক ব্রাহ্মসমাবলম্বী পুরুষ এই ধর্ম্মগ্রহণ ব্যাপারকে বিকৃত ভাষায় পরিণত করেছিল ।

ব্রাহ্মধর্মের আদর্শ বিকৃতকারী এরূপ পুরুষচরিত্রও এ যুগের কোন কোন উপন্যাসে স্থান পেয়েছে। বঙ্কিমের 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসে দেবেন্দ্রনাথ এই জাতীয় ব্রাহ্মধর্মের বিকৃত আদর্শ অনুসারী, বক্তৃতাবাগীশ, নীতিহীন পুরুষ চরিত্রের নিদর্শন। যোগেন্দ্র চন্দ্র বসুর 'ঘরের ভগিনী' — উপন্যাসের নায়িকা কমলিনীর পিতা ডেপুটী রামচন্দ্র অনেকটা এই জাতীয় পুরুষ রূপেই চিত্রিত হয়েছেন —

" এই সময়ে শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেনের যশঃসূর্য।..... ডেপুটী রামচন্দ্র এ সুযোগ ছাড়িলেন না। কেশববাবুর নামে সুতই তাঁহার হৃদয় গলিতে লাগিল। ..... কয়েকমাস কলিকাতে আনাগোনা করিয়া রামচন্দ্র কেশববাবুর ধর্মের সারভাগটুকু ছাঁকিয়া বাহির করিয়া লইলেন।" [২০]

এই রামচন্দ্রের কলিকাতায় অধ্যয়ন কালের বর্ণনাতেও লেখকের ব্যঙ্গ সুপরিস্ফুট —

"রামচন্দ্র বার বৎসর কাল কলিকাতায় ইংরাজী পড়েন। পড়ার সঙ্গে সঙ্গে নানারূপ শিক্ষা - দীক্ষাও পাইয়াছিলেন, ঊনবিংশ শতাব্দীর সেই সবে সূত্রপাত, সুতরাং সহবৎ, সদালাপ, সুনীতি, সুরুচি, এ সবের কতকটা আভাসও পাইয়াছিলেন। কেমন করিয়া ইংরাজীতে বক্তৃতা করিতে হয়, তাহাও তিনি একটু আধটু শিখিয়াছিলেন।" [২১]

রামচন্দ্রের কন্যা কমলিনীর শিক্ষাকে লেখক যে

২০। ঘরের ভগিনী — যোগেন্দ্র চন্দ্র বসু .... পৃঃ ৭৪
২১। ঐ ঐ .... পৃঃ ৬৭

বেশভূষায় ও চেহারায় উপস্থাপিত করেছেন তাতে তাঁকে নব্যশিক্ষিত সমাজের বিশিষ্ট প্রতিনিধি বলেই মনে হয় —

" পুরুষের দীর্ঘ দেহে, রেশমের এক দীর্ঘ পার্সী কোট বিলম্বিত। পরিধানে - ফরেস ডাঙ্গার উৎকৃষ্ট কালাপেড়ে ধুতি। একগাছা খুব মোটা সোনার চেন অর্ধচন্দ্র - রেখায় বুকে ঝুলিতেছে। অধর - ওষ্ঠ, লালবর্ণ। চোখ দুখানি, পটল চেরা। মাথায় চেরা সিঁথি। শরীর হৃষ্টপুষ্ট, মাংসল, অথচ স - সার। মুখটিতে সদা হাসি মাখানো, বয়স পঁচিশ বৎসরের কম নহে, নাম নগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। ইনি কলেজের অধ্যাপক এবং কমলিনীর সাহিত্য শিক্ষক।" [২২]

এই নব্যশিক্ষিত যুবকের পাশে কমলিনীর স্বামীর চেহারার বর্ণনা যেন তৎকালীন রক্ষণশীল হিন্দু সমাজের মূর্তিমান উপস্থিতি —

" সেই জ্যৈষ্ঠ মাসের রোদে তাতিয়া পুড়িয়া অনর্গল ঘাম ঝরাইতে ঝরাইতে এক প্রবীন ব্রাহ্মণ কলিকাতার রাস্তা দিয়া হাঁটিতেছে। বামুনের বয়স অনুমান ৩৭।৩৮ বৎসর, শ্যামবর্ণ, মাথায় টিকি, পায়ে চটিজুতা, নাকে তিলক, স্কন্ধে মুড়ি সেলাই চাদর, পরিধান থানধুতি, গায়ে পিরিহান নাই, মাথায় টোপি নাই, চড়নে গাড়ি নাই, ট্যাঁকে ঘড়ী নাই, হাতে ছড়ি নাই, ব্রাহ্মণ তথাচ বেশ সতেজে রাজপথে চলিতেছে। সঙ্গে একটি মুটে, মাথায় একটি সামান্য মোট করিয়া তাহার সঙ্গে সঙ্গে যাইতেছেন।" [২৩]

২২। মডেল ভগিনী — যোগেন্দ্র চন্দ্র বসু .... পৃঃ ১৯ - ২০

২৩। ঐ ঐ .... পৃঃ ৬

লেখকের সংস্কার শাসিত , রক্ষণশীল , হিন্দুত্ব বোধক পক্ষপাতিত্ব দুষ্ট মনোভাব এখানে প্রকাশিত । ব্রাহ্মসমাজ ভুক্ত নারী পুরুষের নৈতিক অবনতির চিত্র তুলে ধরে তার পাশে হিন্দু সমাজের উচ্চাদর্শ প্রচারের জন্য যে তীব্র ব্যঙ্গের আশ্রয় নিয়ে তিনি 'মডেল ভগিনী'র চরিত্রগুলি অঙ্কিত করেছিলেন , রবীন্দ্র - শরৎযুগের উপন্যাসে সেই ব্যঙ্গের কশাঘাত আর তেমন দেখা যায় না । বরং রবীন্দ্রনাথের 'গোরা' , 'নৌকাডুবি' উপন্যাসে ব্রাহ্ম সমাজভুক্ত আদর্শ পুরুষ চরিত্রের পাশে হিন্দু ও ব্রাহ্ম উভয় সমাজের অতিশয়-দুষ্ট চরিত্র অঙ্কন করে তুলনামূলক চিত্র তুলে ধরেছেন ।

উচ্চ শিক্ষা লাভের জন্য বিদেশে গমন এবং বিলাত ফেরত আখ্যা লাভ সেকালের শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজে বিশেষ আকাঙ্ক্ষিত ছিল । এ প্রবণতা অবশ্য আজও সমভাবেই বিদ্যমান রয়েছে । শিবনাথ শাস্ত্রী , স্বর্ণকুমারী দেবী প্রমুখ তাঁদের উপন্যাসে এই বিলাত ফেরত পুরুষ চরিত্রকে উপস্থাপিত করেছেন পরবর্তীযুগে এই বিলাত ফেরত শিক্ষিত পুরুষের আরও বিস্তৃত পরিচয় পাওয়া যায় ।

রক্ষণশীল হিন্দু সমাজে জাতিভেদের কঠোরতা ছিল প্রবল । ফলে অসবর্ণ বিবাহ সে যুগে অকল্পনীয় ব্যাপার ছিল । বঙ্কিমের রক্ষণশীল মন তাই নব্যশিক্ষায় শিক্ষিত এবং মনুষ্যের প্রতি প্রীতি প্রদর্শনে উৎসুক হলেও বিবাহ ব্যাপারে প্রথাগত সংস্কারকে উপেক্ষা করতে পারেনি । নবকুমার — কপালকুণ্ডলা , রাধারাণী — রজনী কুমার এরা আকস্মিকভাবে পরিচিত হয়ে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হলেও সেখানে সমাজ বিধি লঙ্ঘিত হয়নি ।

কিন্তু বঙ্কিম যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক রমেশচন্দ্র দত্ত তাঁর 'সমাজ' উপন্যাসে ব্রাহ্মণপুত্র দেবী প্রসাদের সঙ্গে কায়স্থ হেমচন্দ্রের কন্যা সুশীলার বিবাহ দিয়ে অসবর্ণ বিবাহকে স্বীকৃতি জানিয়েছেন । এই

অসবর্ণ বিবাহে উদ্যোগী পুরুষ চরিত্র সে যুগে বিরলদৃষ্ট । সেকালের গ্রাম বাংলায় এই অসবর্ণ বিবাহে উদ্যোগী পুরুষকে তার সমাজ বিধি লঙ্ঘনের জন্য একঘরে করা খুবই স্বাভাবিক ছিল । কিন্তু মনাতনবাটী গ্রামের জমিদার রমনীকান্তর পুত্রবিবাহে কোনরূপ বিপত্তি সৃষ্টি করতে সমাজপতিগণ ভীত হয়েছিলেন বলেই উপন্যাসে উল্লিখিত হয়েছে ।

রমেশ চন্দ্র দত্ত অসবর্ণ বিবাহ সম্পর্কে তাঁর মনোভাব প্রকাশ করেছিলেন তাঁর জামাতার কাছে লিখিত নিম্নরূপ পত্রে : —

" On principle inter - caste marriage is a duty with us, because it unites the divided and enfeebled nation, and we should establish this principle (as well as widow marriage etc.) safely and securely in our little society; so that the greater Hindu Society of which we are only a portion and the advanced guard, may take heart and follow." ২৪

— শিক্ষায় ও সামাজিক প্রতিষ্ঠায় সমাজের শীর্ষ শ্রেণীভুক্ত ব্যক্তিরা এই অভিমত ঊনবিংশ শতকের নব্যশিক্ষিত প্রগতিশীল মানসিকতার পরিচায়ক । ব্রাহ্মসমাজে হিন্দুদের মত জাতিভেদের সংকীর্ণতা ছিল না , তাই বাস্তবে সেদিন ব্রাহ্মসমাজ ব্যতীত এই অসবর্ণ বিবাহের স্বীকৃতি হিন্দুসমাজে দেখা যায়নি । সুতরাং হিন্দু সমাজভুক্ত আদর্শবাদী , উদারহৃদয় পুরুষ রমনীকান্তর মুখ দিয়ে লেখক যখন

২৪। বাংলার লেখক — (প্রথম খন্ড) — প্রমথনাথবিশী ...পৃঃ ৪৪

জাতিভেদ প্রথার বিপক্ষে মন্তব্য প্রকাশ করিয়েছেন তখন লেখকের অভিমতই স্পষ্ট হয়ে ওঠে ।

" পূর্বকালে সকল হিন্দুদিগের মধ্যে আহার ব্যবহার ছিল , কি তার আধুনিক নিয়ম । আমরা বিভিন্ন হইয়া জাতীয় দুর্বলতা প্রাপ্ত হইয়াছি । আমাদের মধ্যে ঐক্য সাধন করা দুর্বলতা সংস্কার করা অনেকের অভিপ্রায় , আমরা নিজের চেষ্টায় যদি ঐক্য সাধন করিতে পারি তবে হিন্দু জাতির গৌরবের কি আর সীমা থাকিবে ? যতদিন সেরূপ ঐক্য না হয় , ততদিন বৃথা আমাদের ধর্মশিক্ষা , বৃথা আমাদের সামাজিক উন্নতি , বৃথা আমাদের রাজনৈতিক আন্দোলন ।" [২৫] — শিক্ষা বিভূষিত , বহু অভিজ্ঞতা প্রসূত সংস্কার মুক্ত মনের অধিকারী এই জমিদার ব্যক্তিটি আচরণে ও কথাবার্তায় পূর্ববর্তী বাবু গোষ্ঠীর জমিদার থেকে উল্লেখযোগ্য রকমের পৃথক মানসিকতার পরিচয় দিয়েছেন , যা পল্লীবাসী সামন্ততান্ত্রিক জীবন ধারায় অভিনব । হিন্দু সমাজভুক্ত পল্লীবাসীদের মধ্যে এই অসবর্ণ বিবাহের প্রয়াস আধুনিকতার পরিচয়-দ্যোতক । বিংশ শতকের পরিবর্তিত মানসিকতার আভাস এখানে সূচিত হয়েছে বলা যায় । তাই রমণীকান্ত ও হেমচন্দ্র সে যুগের বিরল দৃষ্টি পুরুষ । যদিও যুক্তি প্রাধান্য অপেক্ষা আবেগের আবাতিশয্য এদের মধ্যে বেশী প্রকাশিত ।

প্রাক্‌ বঙ্কিম যুগের পুরুষেরা সমাজ সচেতনতার পরিচয় দেয়নি । কিন্তু বঙ্কিম যুগের পুরুষেরা সমাজ পরিস্থিতি সম্বন্ধে সচেতন ও পরিবর্তিত নব্য যুব সমাজের আচার আচরণ সম্বন্ধেও যথেষ্ট চিন্তিত , 'রজনী' উপন্যাসের নায়ক রজনীকান্তের পিতা দীনবন্ধুর উক্তি এই পরিস্থিতি সচেতনতার পরিচায়ক —

২৫। উপন্যাস গ্রন্থাবলী — রমেশচন্দ্র দত্ত (হিতবাদী প্রকাশিত).. পৃঃ ৭০১

" দেশে যে নিত্য নানা পরিবর্তন ঘটিতেছে , তাহাতে কোন সন্দেহ নাই । দেখনা কেন , কয়েক বৎসরের মধ্যে কত পরিবর্তন ঘটিয়াছে , ধর্ম্মে , সমাজে , পরিবারে , লোকের মনে কত নূতন ভাব আসিতেছে । একদিকে ইংরেজী শিক্ষা , সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজী ভাবের আমদানি , আর একদিকে লোকের মনে সংশয় ও অবি•বাস বাড়িতেছে । ফলে যে কি দাঁড়াইবে কিছুই বুঝা যায় না ।" ২৬

ঊনবিংশ শতকের পরিবর্তিত পরিস্থিতি সম্বন্ধে এই সচেতনতাই মেয়েলের পুরুষ চরিত্রকে নতুন চিন্তার যোগান দিয়েছে যার ফলে বিভিন্ন আন্দোলনে সে যুগের পুরুষেরা ব্রতী হয়েছিল, যার ধারা পরবর্তীযুগে আরও ব্যাপক হয়েছে । ঊনবিংশ শতকের সামাজিক , রাজনৈতিক , ধর্ম্মীয় বিভিন্ন আন্দোলনের যে পরিচয় পাওয়া যায় তাতে বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের সুর প্রথমদিকে অনুচ্চই বলা যায় । শতাব্দীর মধ্যবর্ত্তী কালে 'সিপাহী বিদ্রোহ' সংঘটিত হলেও শিক্ষিত মানসে বৃটিশ শক্তির বিরোধিতা তখনও প্রবল হয়নি । জাতীয়তাবোধ, স্বদেশ প্রেম , দেশের রাজনৈতিক উন্নতি, সামাজিক প্রগতি প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে অগ্রণী ও উৎসাহী দেশবাসীরা বৃটিশ শক্তিকে অপসারণের চিন্তা কেউ করেননি । বঙ্কিমের 'আনন্দ মঠ' উপন্যাসে সত্যানন্দের প্রতি মহাপুরুষের উক্তিতে বৃটিশ শাসনকেই এদেশের যোগ্য ও প্রয়োজনীয় বলে নির্দেশিত হয়েছে । কিন্তু চন্ডীচরণ সেনের উপন্যাসে বৃটিশ শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের যে সুর পাওয়া যায় , তা এরেই ধূমায়িত হয়ে শতাব্দীর শেষ পর্যায়ে প্রবল আকার নিয়ে বিংশ শতকের প্রথমেই সগর্জ্জনে ফেটে পড়ে বঙ্গ ভঙ্গ আন্দোলনের মধ্য দিয়ে । বিদেশী শাসকের প্রতি বিরূপ মনোভাবাপন্ন পুরুষ চরিত্রকে উপন্যাসে উপস্থাপিত করেছেন

২৬। অন্বিনী — নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত .... পৃ: ২৫

স্বর্ণকুমারী দেবী তাঁর 'স্নেহলতা' উপন্যাসে নবীন ও জীবনের চরিত্রে। শিবনাথ শাস্ত্রীর 'নয়ন তারা' উপন্যাসের নায়ক হরেন্দ্রনাথ একদিকে দেশবাসীর দুর্বলতা সম্বন্ধে সচেতন অপরদিকে জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ। বালক ও যুব সম্প্রদায়কে শরীর চর্চায় উৎসাহী করে তাদের নিয়ে নানা সৎকার্যে ব্রতী হওয়ার মধ্যে যেন আগামী যুগের জাতীয় আন্দোলনকারী পুরুষ চরিত্রের ভূমিকা প্রচ্ছন্ন রয়েছে। বঙ্কিমের উপন্যাসে আমরা যেমন সর্বগুণযুক্ত আদর্শ পুরুষ চরিত্রের পরিচয় পাই হরেন্দ্রনাথ তাদেরই সমগোত্রীয়। আবার তার শিক্ষা - কর্তব্যবোধ - সৎকার্যাবলী অনুষ্ঠানের মধ্যে পরবর্তী জাতীয় আন্দোলনের নেতৃস্থানীয় পুরুষ চরিত্রের গুণাবলীর ইংগিত পাওয়া যায়।

পুরুষ চরিত্রে ধূমপান প্রবণতায় সিগারেটের নেশা তখনও প্রকট হয়নি। বরং দেখা গেছে হুঁকা - গড়গড়া মধ্যযুগীয় জীবনের অঙ্গীভূত অবস্থা থেকে বঙ্কিম যুগেও উপন্যাসের নেশার উপাদান হিসাবে সাদরে গৃহীত হয়েছে। চা পানের প্রবণতা তখনও দেখা দেয়নি।

পুরুষের নেশার অন্যতম উপাদান সিগারেট এবং আতিথেয়তায় 'চা' এর প্রচলন পরবর্তী যুগের উপন্যাসে - বিশেষ করে রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্রের রচনায় পাওয়া যাবে।

বঙ্কিমের ও তাঁর যুগের ঔপন্যাসিকদের রচনায় আমরা যে পুরুষ চরিত্রের পরিচয় পাই তাঁদের জীবনের প্রধানতম সমস্যা নারীপ্রেম কেন্দ্রিক। ঐতিহাসিক - সামাজিক - পারিবারিক প্রায় সমস্ত পর্যায়ের উপন্যাসের পুরুষ চরিত্রই জীবনে প্রেম সমস্যার সংকটে পীড়িত হয়েছে। এই শতকের নানাবিধ সামাজিক আন্দোলনের পরিচয় উপন্যাসে বিধৃত হলেও পুরুষের জীবনের মূল সমস্যা তার ব্যক্তিগত জীবনকে অতিক্রম করে বৃহত্তর প্রেক্ষাপটে তখনও তেমন বিস্তৃত হয়নি। দারিদ্র্য ও বেকারত্বের সমস্যাগুলির উপন্যাসে ব্যাপক ভাবে

অঙ্কিত হতে দেখা যায় না ।

প্রেম সমস্যার তীব্রতার চিত্র অঙ্কিত হয়েছে নগেন্দ্র গুপ্তের 'তমস্বিনী' উপন্যাসে । বাংলায় এটিই প্রথম যৌনভাবাশ্রিত উপন্যাস বলে নির্দেশিত । এখানে দেখা যায় স্বর্ণময়ী ও হেমন্তকুমার পরস্পরের প্রতি প্রণয়ের তীব্রতায় সমাজবিধিকে লঙ্ঘন করে অবৈধ জীবন যাপনের পথে ব্রতী হয়েছে । হেমন্তকুমারের প্রতি পূর্ব আসক্তির তীব্রতা স্বর্ণকে তার স্বামীগৃহ ত্যাগে প্ররোচিত করেছে এবং হেমন্তকুমার তার পূর্ব প্রণয়িণীকে নিয়ে সমাজ সম্পর্কচ্যুত অবৈধ নিঃসঙ্গ জীবনে কালাতিপাত করেছে । কিন্তু বঙ্কিম যুগ সমাজের বিরুদ্ধে ব্যক্তিকে কখনই সংগ্রামে জয়ী হতে দেয়নি । তাই পরস্ত্রীকে নিয়ে এই অবৈধ জীবন যাপন, বিশেষতঃ সমাজ সম্পর্কচ্যুত নিঃসঙ্গতায় হেমন্তকুমারের নীতিবোধ তাকে পীড়িত করেছে । তারই ফলশ্রুতি স্বর্ণের প্রতি তার বিরূপ মনোভাবের প্রকাশ এবং জলে ডুবে আত্মহত্যার দ্বারা স্বর্ণের জীবনাবসান ।

এই অবৈধ জীবন যাপনের জন্য নারী ও পুরুষ চরিত্রে অন্তর্দ্বন্দ্বের তীব্রতা উপন্যাসে তেমন পরিস্ফুট নয় ।

বঙ্কিম ও তাঁর যুগের ঔপন্যাসিকরা যে পুরুষ চরিত্রের সঙ্গে আমাদের পরিচিত করিয়েছেন তাঁদের পরিবেশ – শিক্ষা – পেশা রুচিবোধ – মানসিকতা ইত্যাদিতে যে বৈচিত্র্যের সন্ধান পাওয়া যায় তদনুযায়ী বিভিন্ন পর্যায়ে বিভাগ করলে এদের যে বৈশিষ্ট্যগুলি স্পষ্ট হয়ে ওঠে তা নিম্নরূপ –

(১) ভূদেবের 'অঙ্গুরীয় বিনিময়' উপন্যাসে শিবাজীর চরিত্রকে উপস্থাপিত করার পর থেকে অতীতের আদর্শ পুরুষ চরিত্র অবলম্বনে ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনার যে প্রবণতা দেখা দিয়েছিল, সমকালীন স্বদেশভাবনা, জাতীয়তাবোধে পুষ্ট হয়ে বঙ্কিমযুগে তা পল্লবিত হয়েছে । ফলে এ যুগের

উপন্যাসে স্বদেশপ্রেমিক , আদর্শগুণ যুক্ত অনেক ঐতিহাসিক পুরুষ চরিত্রের সঙ্গে আমরা পরিচিত হই ।

(২) পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রবর্তনের ফলে দেশে যে নবশিক্ষিত পুরুষের সৃষ্টি হয়েছিল বিভিন্ন উপন্যাসের পাতায় সেই সব কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ঔজ্জ্বল্যধারী পুরুষ চরিত্র উপস্থাপিত হয়েছে ।

(৩) এদেশের তৎকালীন প্রচলিত সামাজিক কু সংস্কার কৌলীন্য প্রথা , বাল্য ও বহুবিবাহের অনুসৃতি বহু উপন্যাসের পুরুষ চরিত্রে দেখানো হয়েছে ।

(৪) দেশের সমকালীন পরিস্থিতি সম্বন্ধে সচেতনতা কোন কোন উপন্যাসের পুরুষ চরিত্রে পরিলক্ষিত । বিধবা বিবাহ আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে বিধবার জীবনের সমস্যা সম্বন্ধে সহানুভূতিশীল এবং বিধবার প্রণয়ও বিবাহকে স্বীকৃতি দানকারী পুরুষ চরিত্রের পরিচয়ও পাওয়া যায় ।

(৫) ব্রাহ্ম সমাজভুক্ত আদর্শ গুণযুক্ত ও ব্রাহ্মধর্মের বিবৃত ব্যাখ্যানধারী পুরুষ চরিত্রও কোন কোন রচনায় অঙ্কিত ।

(৬) একদিকে যৌথ পরিবার কেন্দ্রিক জীবনে স্বীয়পরিবার বর্গের প্রতি দায়িত্ব বোধের অভাব , পল্লীবাসী পুরুষের দারিদ্র্যের পীড়ন , অপর দিকে যৌথ পরিবার এর নীতির প্রতি বিমুখতা , পল্লীবাস ত্যাগ করে শহর জীবনে আকর্ষণ — এই উভয়বিধ বৈশিষ্ট্যযুক্ত পুরুষ চরিত্রের পরিচয় একালের অনেক উপন্যাসে বিধৃত হয়েছে ।

(৭) গ্রামে জমিদার প্রথার বিদ্যমানতা , শহরে শিক্ষা দীক্ষার বিস্তার স্কুল - কলেজ - কোর্ট - কাছারি স্থাপন ইত্যাদির ফলে বিভিন্ন পেশায়

নিযুক্ত মধ্যবিত্ত বাঙালী পুরুষের পরিচয়ও এ যুগের উপন্যাসে তুলে ধরা হয়েছে। আবার শিক্ষিত পুরুষের বেকারত্বের সংকটের চিত্রও পাওয়া যায়।

(৮) বিলাত ফেরত - ইঙ্গ বঙ্গ সমাজের অন্তর্ভুক্ত পুরুষ চরিত্রও এযুগের উপন্যাসে যথাযথ স্থানে সুচিত্রিত।

(৯) বঙ্কিম যুগে রোমান্স রসের প্রাচুর্য্য, ঐতিহাসিক, সামাজিক, পারিবারিক প্রায় সর্বপ্রকার উপন্যাসেই রোমান্সের আধিক্য। ফলে অধিকাংশ উপন্যাসে চরিত্রগুলি আদর্শ লোকের উত্তুঙ্গ প্রদেশে অবস্থিত। যাদের মধ্যে যুক্তি অপেক্ষা ভাবাবেগের প্রবলতাই জীবনকে পরিচালিত করেছে।

বাস্তব পরিবেশের চরিত্র অঙ্কন প্রয়াসও কোন কোন উপন্যাসে দেখা যায়।

(১০) এ যুগের উপন্যাসের অন্তর্গত পুরুষ জীবনের সমস্যা মূলত: নারীরূপ মুগ্ধতা ও প্রণয় ঘটিত জটিলতা।

উপন্যাসের চরিত্র অবশ্যই সংগ্রামশীল। বঙ্কিমযুগের ব্যক্তিরা রক্ষণশীল সমাজ ও তার নৈতিক বিধি ব্যবস্থার সঙ্গে সংঘাতে লিপ্ত হয়েছে দেখা যায়। প্রাক্ বঙ্কিম যুগে সমাজ ও ব্যক্তির এই সংঘাত প্রবলতা নেই। বঙ্কিমচন্দ্রের রচনায় এবং বঙ্কিম যুগের ঔপন্যাসিকদের লেখায় আমরা ব্যক্তি বনাম সমাজের সংঘর্ষের চিত্র দেখতে পাই। এই সংঘাতে ব্যক্তি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পরাভূত কিন্তু এই পরাভবের মধ্যেই আগামী দিনের ব্যক্তিমর্যাদার প্রাধান্যের সূচনা। সমাজের সঙ্গে বিরোধিতায় প্রবৃত্ত হবার মতো চিন্তাধারা যে ব্যক্তিরা এনলে দিয়েছে তারা দীর্ঘকাল লালিত অন্তর সংস্কারের কাছে এখন

পরাভূত হলেও আগামী দিনের সংগ্রামে সমাজের বিরুদ্ধে ব্যক্তির জয়লাভের পথ এরই সূচিত করে গেছে বলা যায়। পরবর্তী যুগের উপন্যাসে দেখা যাবে সমাজ — ব্যক্তি সংঘর্ষে সমাজ আর আগের মত যুক্তিহীন অন্ধশক্তির পরিচয় দিতে পারছে না। ব্যক্তি তার আত্ম প্রতিষ্ঠার পথে অগ্রণী হয়েছে।

বঙ্কিম যুগের এই পুরুষেরা এরপরে রবীন্দ্র - শরৎযুগের মধ্য দিয়ে, কল্লোল যুগের সংশয় সংকটের পথ বেয়ে কিভাবে বিবর্তনের ধারায় এগিয়ে চলেছে পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে আমরা সেই পরিচয় লাভের চেষ্টা করব।